দারোগা ডাঙার দাদুভাই

মোশাররফ হোসেন খান

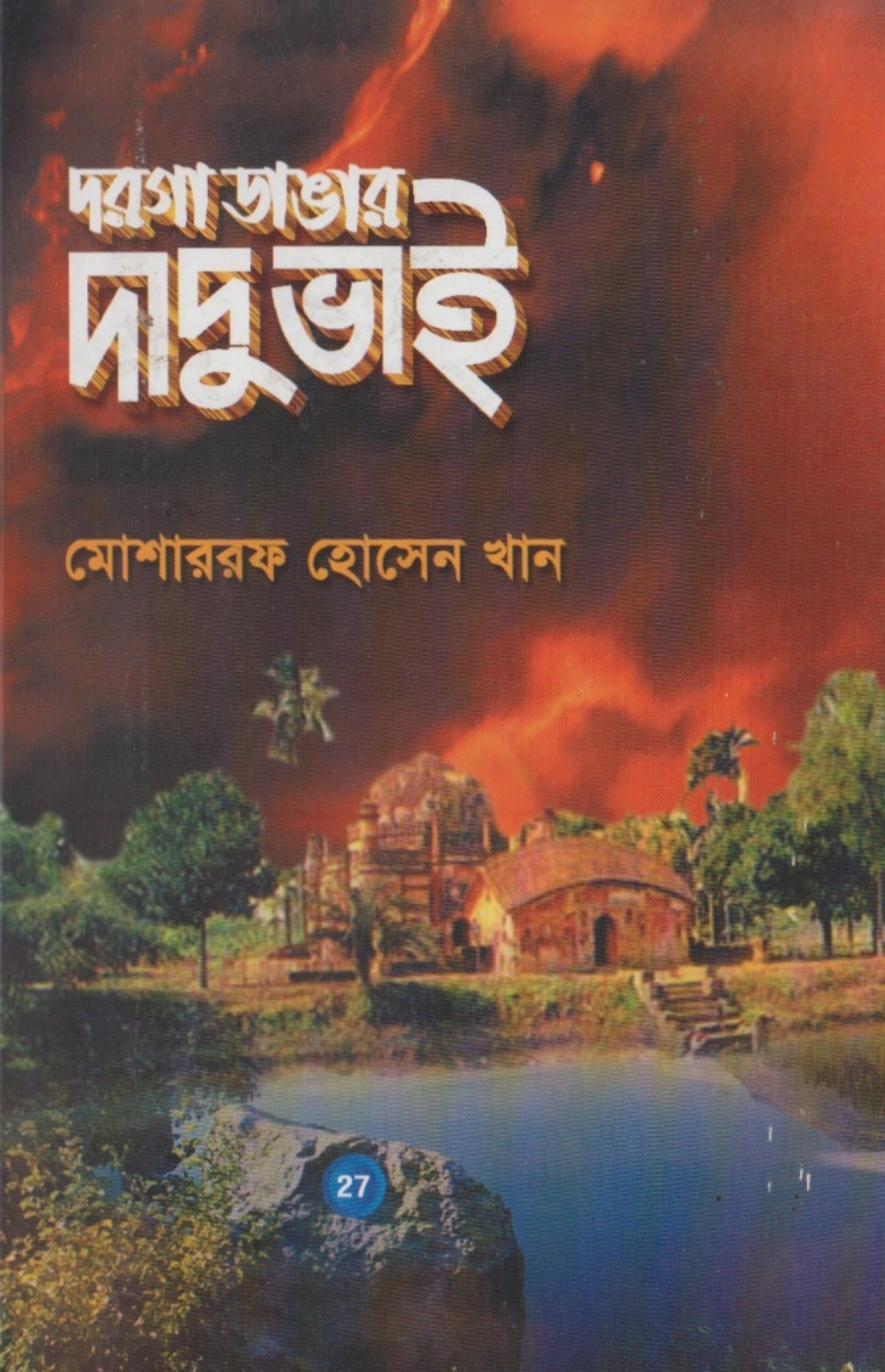

27

بسم الله الرحمن الرحيم

WAMY Book Series-27

দরগা ডাঙার দাদুভাই

মোশাররফ হোসেন খান

World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office
House # 17, Road # 05, Sector # 07
Uttara Model Town, Dhaka
Phone: 8919123
www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দরগা ডাঙার দাদুভাই
মোশাররফ হোসেন খান

Darga Dangar Dadubhai
Mosarraf Hussain Khan

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ২০০৮

1st Edition
March, 2008

প্রকাশক
দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস
বাড়ী-১৭, রোড-০৫, সেক্টর-০৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা
ফোনঃ ৮৯১৯১২৩, ফ্যাক্সঃ ৮৯১৯১২৪

Published by:
Da'wah & Education Department
World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office
House-17, Road-05, Sector-07
Uttara Model Town, Dhaka
Phone: 8919123, Fax: 8919124

কম্পোজ ও মুদ্রণ
নাবিল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মোবাইল : ০১৭১৪-০১৫৯৭৭

Compose & Print
Nabil Computer & Printers
Mob: 01714-015977

শুভেচ্ছা মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

Price
Twenty Five Taka Only

www.pathagar.com

পরিচালকের কথা

বাংলাদেশের খ্যাতিমান কবি ও কথাশিল্পী, মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক ও মাসিক নতুন কিশোর কণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক মোশাররফ হোসেন খান রচিত 'দরগা ডাঙার দাদুভাই' গ্রন্থটি সুখপাঠ্য তো বটেই, তদুপরি এটা কিশোর, যুবকসহ সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য শক্তি, সাহস, স্বপ্ন এবং প্রকৃত মানুষ হবার উজ্জ্বল প্রেরণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

তরুণ-যুবকদের সুন্দর চরিত্র এবং জীবনগঠনমূলক এধরনের উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে খুবই বিরল। সুতরাং এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি করার জন্য কবি, কথাশিল্পী মোশাররফ হোসেন খানকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ। তাঁর কাছ থেকে এধরনের শিক্ষা এবং চরিত্র গঠনমূলক আরও গ্রন্থের প্রত্যাশা করছি।

আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থটি পাঠক নন্দিত সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আমাদের যাবতীয় নেক আমলসমূহকে কবুল করুন। আমিন।

ডা. মোহাম্মদ রেদওয়ানুর রহমান
ডাইরেক্টর
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা।
০৫-০৩-২০০৮

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

প্রথমেই শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি সেই মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাদের একমাত্র মালিক এবং অভিভাবক। দরুদ ও সালাম রাসূলকে (সা.), যিনি মানবতার মুক্তির একমাত্র দিশারী।

ওয়ামী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তোলার জন্য গ্রহণ করেছে বহুমুখী কার্যক্রম। এর অংশ হিসেবে World Assembly of Muslim Youth (WAMY) Bangladesh Office দাওয়া ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্ম-কান্ড পরিচালনা করছে। এই কর্মপ্রবাহের একটি অন্যতম দিক হলো তার প্রকাশনা। ইতিমধ্যেই ওয়ামী বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী প্রকাশের মাধ্যমে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। তারই ধারাবহিকতায় এবার প্রকাশিত হচ্ছে নন্দিত কবি ও কথা শিল্পী মোশাররফ হোসেন খানের কিশোর-যুবকদের প্রকৃত আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার এক অসামান্য প্রেরণা জাগানোর উপন্যাস 'দরগা ডাঙার দাদুভাই'।

মোশাররফ হোসেন খান একাধারে কবি, কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক এবং শিশু সাহিত্যিক। তিনি মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক এবং মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক। তিনি আমাদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের শেকড় সন্ধানী এক উজ্জ্বল কবি ও কথাশিল্পী। বর্তমান গ্রন্থটিতেও রয়েছে তার সেই ছাপচিত্র।

আমরা জানি, কিশোর যুবকরাই প্রতিটি দেশ ও সমাজের জন্য মূল সম্পদ। সুতরাং তাদেরকে যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অপরিসীম। বর্তমান গ্রন্থের পরতে পরতে লেখক সেই চেষ্টাই করেছেন। গ্রন্থের ভাষা সহজ, সাবলীল এবং আকর্ষণীয়। বোধকরি সকল শ্রেণীর পাঠক গ্রন্থটি পাঠ করে সমান তৃপ্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করবেন। যুব সমাজের জন্য গ্রন্থটি স্বপ্ন জাগানোর ভূমিকা পালন করবে। তারা এর মধ্য দিয়ে উন্নত চরিত্র এবং প্রকৃত মানুষ হবার শিক্ষা লাভ করবে। আল্লাহর পথে নিজেদেরকে বিলিয়ে দেবার অনুপ্রেরণায় তারা উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশনার ক্ষেত্রে লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলেই আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এজন্য তাঁদেরকে মুবারকবাদ।

রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে কবুল করুন। আমিন।

আলমগীর মোহাম্মদ ইউসুফ
ইনচার্জ
দাওয়া এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ামী বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা।
০৭-০৩-২০০৮

www.pathagar.com

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলীনের জন্য যিনি সকল প্রকার বাধা-বিঘ্ন, দুর্যোগ দুর্বিপাক এবং প্রতিকূল পরিবেশ টপকে আমাকে সাহিত্যের খেদমতে এই পর্যন্ত নিবেদিত থাকার তৌফিক দান করেছেন।

একজন মুমিনের কোনো কাজই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমার সাহিত্যকর্মেরও একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। সেটা হলো আমাদের আদর্শ, ঐতিহ্য এবং চিরকল্যাণকর দরজাকে পাঠকের সামনে খুলে দেয়া। বর্তমান গ্রন্থ 'দরগা ডাঙার দাদুভাই'- সেই ধারাবাহিকতারই ফসল।

কিশোর-যুবকদের চরিত্র গঠন এবং বড় মাপের আদর্শিক মানুষ হবার স্বপ্নটাকে জাগিয়ে তোলাই ছিল আমার এই গ্রন্থটি লেখার মূল উদ্দেশ্য। আলহামদুলিল্লাহ! উপন্যাসটি যখন একটি কিশোর পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশ পেল, তার পরপরই আসতে শুরু করলো পাঠকের পক্ষ থেকে প্রাণনিংড়ানো ভালোবাসার শুভেচ্ছা। বহু তরুণ সাক্ষাৎ করে তাদের লক্ষ্যপথ নির্নয়ের কথা জানিয়েছে। অনেকেই তাদের হৃদয়ের আকুতির কথা অকপটে সময়োপযোগী এই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে দ্রুত প্রকাশের জন্য।

আমি আমার সকল ভক্ত-অনুরক্ত এবং শুভানুধ্যায়ী পাঠকের প্রতি কৃতজ্ঞ। সমান কৃতজ্ঞ ওয়ামীর অন্যতম কর্ণধার একান্ত বন্ধুবর আলমগীর মোহাম্মদ ইউসুফ ভাই-এর কাছেও। কারণ তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা, বাসনা আর ক্রমাগত তাগিদেই এই গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখতে পারছে। ওয়ামীর সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। দোয়া করছি, আল্লাহপাক প্রত্যেকের আন্তরিকতা ও কাজের যথাযথ পুরস্কার দান করুন।

যে উদ্দেশ্যে এই উপন্যাসটি লেখা, যদি সেই স্বপ্ন-সফলতা বিস্তারে এতটুকু ভুমিকা রাখে, তাহলে নিজেকে সার্থক মনে করবো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই গ্রন্থসহ সকলকেই কবুল করুন। আমিন।

মোশাররফ হোসেন খান
সম্পাদক
নতুন কলম
১৮-১২-২০০৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দূরের আকাশ ঘন হয়ে এসেছে।

সন্ধ্যা নেমে এলো।

মসজিদ থেকে মাগরিবের নামায আদায় করে বের হয়েছেন জাফরী সাহেব। হাতে তাসবীহ্ দানা। ক্রমাগত ঘুরছে দানাগুলো ডান হাতের আঙ্গুলে।

সন্ধ্যার আবছা আলো-আঁধারিতে দানাগুলো জ্বল জ্বল করছে। আজমীর শরীফ থেকে তিনি এই তাসবীহ ছড়াটি এনেছিলেন বেশ ক'বছর আগে।

বাড়ি থেকে মসজিদের দূরত্ব খুবই সামান্য।

উঠোনে পা দিতেই শেষ হয়ে যায় জাফরী সাহেবের তাসবীহ পাঠ। এখন উঠোনের চেয়ারে কিছুক্ষণ বসবেন। একটা পান খাবেন। তারপর উঠবেন বারান্দায়। এটা তাঁর প্রায় রুটিন হয়ে গেছে।

উঠোনের সান্ধ্যকালীন পয়-পরিষ্কার করার পর মাগরিবের নামায আদায় করছেন রুকাইয়া। তার নামায তখনও শেষ হয়নি। নামায শেষে জায়নামাযে বসেই তিনি কিছুক্ষণ তাসবীহ পাঠ করবেন। তারপর আবার লেগে যাবেন সংসারের নিয়মিত কাজে।

জাফরী সাহেব উঠোনে পৌঁছে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে পড়লেন। তারপর গলা খাকারি দিয়ে ডাকলেন, বউমা!...

আহ! কীযে মধুর ডাক!

ঐ ডাকটির মধ্যে যেন সকল স্নেহ, আদর আর মমতা জড়িয়ে আছে।

প্রায় আশি বছর বয়সেও তাঁর ঐ ডাকটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। সেই একই স্বর, সেই একই মমতা।

তাসবীহ পাঠ শেষ হতেই ডাকটি শুনলেন রুকাইয়া।

জায়নামাযটি ভাঁজ করতে করতে তিনি জবাব দিলেন, আসছি আব্বাজান!...

রুকাইয়া জানেন ডাকটির অর্থ। তিনি ডাকছেন মানে, তাঁর এখন প্রয়োজন এক গ-াস পানি আর পান।

জায়নামায ভাঁজ করে বাঁশের আড়ায় রেখে তিনি পানের ডালা সামনে নিয়ে বসলেন। যাঁতি দিয়ে কুঁচি কুঁচি করে সুপারি কাটলেন। তারপর ছোট্ট পানবাটার বাঁশের চোঙ্গার ভেতর ঢুকিয়ে বাটতে শুরু করলেন।

জাফরী সাহেব উঠোনে বসে শুনছেন, পানবাটার ক্রমাগত ছন্দমধুর শব্দ। তিনি

www.pathagar.com

আবার ডাকলেন, বউমা!...

কাজ করতে করতেই রুকাইয়া জবাব দিলেন, এই যে আব্বাজান! আসছি। পানটা হাতে করে আনছি।

জাফরী সাহেবের গলা এবার একটু অন্য রকম। বললেন, পানতো দিচ্ছ, কিন্তু মেহরাজকে দেখছি না কেন? মাগরিবের জামাতেও তো তাকে দেখলাম না। কোথায় গেছে, বলে গেছে কি?

জ্বি আব্বাজান! আসরের পর ও সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাজারের স্কুলমাঠে নাকি ওদের কোন্ প্রোগ্রাম আছে। ফিরবে একটু রাত করে। আপনাকে বলতে বলে গেছে।

জাফরী সাহেব আসরে মসজিদে যান। আসর শেষ করে আর বাড়িতে আসেন না। মসজিদে বসে মাগরিব পর্যন্ত দোয়া-দরূদ ও তাসবীহ তাহলীলে সময় কাটান।

এই বয়সে বেশি হাঁটাহাঁটি করতেও তাঁর কষ্ট হয়। বুঝলেন, তাকে কাছে না পাবার কারণে মেহরাজ বলে যেতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে লেখা-পড়া বাদ দিয়ে রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা? না, এটা তিনি পছন্দ করতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, রাত করে বাড়ি ফিরলে পড়বে কখন?

গ-াসে পানি আর অন্য হাতে পান এগিয়ে দিয়ে রুকাইয়া বললেন, ওরতো পরীক্ষা শেষ। কদিন একটু বিশ্রাম নিতে চাইছে। তাই আর বাধা দিলাম না।

জাফরী সাহেব একটু হাসলেন। বললেন, সত্যিই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম যে ওর এস.এস.সি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। তা ভাল। একটু ঘুরাফেরা করে সময় কাটাক। কটা মাস, মাস কেন, প্রায় পুরো বছরটিই তো লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। কত কষ্ট করেছে।

কিন্তু বউমা, তারপরও বলে রাখি– ছেলেকে একটু চোখে চোখে রেখ। দিনকাল যা পড়েছে! বোঝই তো, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ!'

মাথার আঁচল টেনে হাসতে হাসতে রুকাইয়া বললেন, জ্বি আব্বাজান।

উঠোনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কাজ। এখানে ট্যাপারি, ওখানে টুল, আর একখানে ঝুড়ি, ও মাথায় খোন্তা, কুড়াল, কোদাল আরও কত কি! সবই গুছিয়ে আবার জায়গামত রাখতে হবে। তারপর রান্নাঘরের কাজতো আছেই।

তারাবাজির মত হাত চলছে রুকাইয়ার। সব কাজ সময়মত শেষ করতে হবে। তিনি কাজ করছেন দ্রুত।

কিন্তু তার মধ্যেই আবার ঘুরেফিরে মাথায় ভিড় করছে শ্বশুরের সতর্ক বাণীটি।

www.pathagar.com

তাঁর কথাটি খুব গুরুত্বের সাথে ভাবছেন। বিষয়টি না ভেবে উপায় কি? সত্যিই তো দিনকাল যা পড়েছে, তাতো রীতিমত ভয়ঙ্কর! পরিবেশ কলুষিত হয়ে উঠছে। কি শহর, কি গ্রাম- কোথাও কি আর শান্তি আছে?

রুকাইয়া ভাবছেন।

তার হৃদয়ের খুব গভীরে একটি অজানা আশংকার কম্পনও অনুভব করেন। আবার আশা এবং বিশ্বাসে বুকও বাঁধেন। মনে মনে বলেন, না, আমার মেহরাজ! আর যাই হোক নষ্ট হতে পারে না। কেন হবে? কেমন করে হবে? পৃথিবী পচে যাক, পৃথিবীর সকল মানুষ নষ্ট কিংবা বখে যাক, তবু, তবুও মেহরাজের তো খারাপ যাওয়া উচিত নয়।

উঠোনের কাজ শেষ।

এবার ল্যাম্প হাতে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। মাটির হাঁড়া থেকে চাল উঠালেন বেতের পালিতে। চাল নিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছেন তিনি।

জাফরী সাহেব তখনও বসে আছেন উঠোনের চেয়ারে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। দেখছেন আকাশের চারপাশ।

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন, মাগো! সম্ভবত আগামীকাল বৃষ্টি হতে পারে। একটু সতর্ক থেকো। কিছু গুছানোর প্রয়োজন হলে গুছিয়ে নিও।

আশ্চর্য ব্যাপার! আকাশের দিকে তাকিয়ে জাফরী সাহেব অগ্রিম বৃষ্টির খবর দিতে পারেন! অনেকের কাছেই যাদুকরী ব্যাপার হলেও একমাত্র তিনিই জানেন, এটা যাদু নয়– বয়সেরই অভিজ্ঞতা। ক্রমাগত দেখতে দেখতে তিনি পৃথিবী থেকে, প্রকৃতি থেকে এই অভিজ্ঞতার পাঠ নিয়েছেন।

শ্বশুরের কথা শুনে হাসলেন রুকাইয়া। তিনিও জানেন, আব্বাজানের এ ধরনের ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়ে যায়। বললেন, ঠিক আছে। গুঁড়োগুলো একটু শুকানোর দরকার ছিল। বাদবাকি আর সব গুছিয়ে ফেলেছি। আপনি আর বাইরে বসবেন না। এবার বারান্দায় উঠুন। বিছানা ঠিক করে দিয়েছি।

জাফরী সাহেব আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, বউমা! দেখেছো, এই যে আকাশ, এই যে নক্ষত্র, এই যে চাঁদ, এই যে কার্পাস তুলোর মতো সাদা সাদা মেঘের ভেলা– কী চমৎকার! এই যে দেখছি, প্রতিদিনই দেখছি, দেখতে দেখতেই তো পেরিয়ে এলাম প্রায় আশিটি বছর। কই, এগুলো তো কখনও পুরনো মনে হয় না! কখনও তো একঘেয়ে কিংবা বিরক্তিকর মনে হয় না! বরং যতই দেখি ততই নতুন মনে হয়। মনে হয় আজই প্রথম দেখছি। কী বিস্ময়কর ব্যাপার তাই না!

রুকাইয়ার কাছে এ ধরনের কথা নতুন কিছু নয়। তিনি প্রায়ই এসব শুনে শুনে

www.pathagar.com

তার মধ্যেও এক ধরনের চিন্তার দুয়ার খুলে গেছে।

যাবে না কেন!

কম করে হলেও তো প্রায় ত্রিশ বছর রুকাইয়া এই সংসারেই আছেন। বলতে গেলে এই সংসারে এসেই তো তিনি পরিপূর্ণ হয়েছেন বোধের দিক থেকে, চিন্তার দিক থেকে। এই বাড়ির প্রতিটি ধূলিকণার সাথে তিনি পরিচিত। স্কুল ত্যাগের পর এই বাড়িতে এসেই তার বইপড়ার অভ্যাস আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে। তাও তো ঐ মানুষটির জন্যই।

রুকাইয়া ভাবেন, আমার তো মা নেই, আব্বা নেই, কেউ নেই। আর স্বামী! তিনিও তো চলে গেছেন সেই কবে। কিন্তু কোনো কষ্ট, কোনো শোকই আমাকে দুমড়ে মুচড়ে দিতে পারেনি কেবল ঐ মহৎ মানুষটির জন্য। তিনি তো কেবল আমার শ্বশুরই নন, আমার পিতাও বটে। একজন পিতা যেভাবে তার সন্তানকে আগলে রাখেন, তিনিও আমাকে সেইভাবে আগলে রেখেছেন। এই বয়সেও তিনি আমাকে কোনো কষ্টই করতে দেন না। কী অপরিসীম দরদ আর ভালবাসার মোড়কে তিনি ঢেকে রেখেছেন আমাকে আর আমার একমাত্র সন্তান মেহরাজকে। এ ঋণ আমি কি দিয়ে শুধবো?

ভাবতে ভাবতে রুকাইয়ার চোখ দু'টো ছল ছল করে উঠলো।

ক্রিং ক্রিং বেল বাজতেই রুকাইয়া বুঝলেন, মেহরাজ ফিরেছে।

মা, মা বলে ডাকতে ডাকতে মেহরাজ সাইকেল ঠেলে উঠোনে এসে দাঁড়ালো।

রান্নাঘর থেকে রুকাইয়া বললেন, মেহরাজ! আগে তোর দাদুভায়ের সাথে দেখা কর। তারপর কলপাড় থেকে হাতমুখ ধুয়ে আয়।

ঘরের দেয়ালের সাথে সাইকেলটি ঠেস দিয়ে রেখে দিল মেহরাজ।

বাজার থেকে সাইকেল চালিয়ে এসে ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। গায়ের সাথে জামা লেপ্টে আছে। কিন্তু জামা খোলারও অবকাশ নেই তার। কারণ সেও জানে, দাদুভাইকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে একপাও বাইরে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু আজ সে গেছে। তার নিজের কাছে খুব খারাপ লাগছে। সারাক্ষণ কেবল নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়েছে তার।

ঘামে ভেজা শরীর। পায়ে ধুলো-বালি। সেই অবস্থায় মেহরাজ গলা ছেড়ে ডাকতে ডাকতে বারান্দায় উঠে পড়লো, দাদুভাই! দাদুভাই! ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি!

ঘুম নয়। একটু তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন জাফরী সাহেব।

বয়স হয়েছে।

এই বয়সে আর আগের মত নিয়ম মেনে চলতে পারেন না। হারিকেনের আলোয়

www.pathagar.com

বই পড়তে পড়তে কখন যে তাঁর চোখ দুটো এমনিতেই বুঁজে এসেছে বুঝতেই পারেননি। চোখে চশমা। বুকের ওপর বাদুড়ের ডানার মত দু'ভাঁজ করা উপুড় হয়ে পড়ে আছে 'তিতুমীর' বইটি।

দাদুভাই!

এই একজন মানুষ বটে। এই বয়সেও তিনি পড়তে পারেন। প্রচুর পড়েন। বলতে গেলে বই পড়েই তিনি সময় কাটান। এত যে পড়েন তবুও তিনি ক্লান্ত হন না। বই পড়ার এমন নেশা আর কখনও কাউকেই দেখেনি মেহরাজ। বাড়িতে প্রচুর বই। তারপরও প্রতিমাসে বই কিনতে হয়ে দাদুভায়ের জন্য। কী নয়? ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন– কোনো কিছুতেই দাদুভায়ের অরুচি নেই। তবে সাহিত্যের ব্যাপারেই তাঁর ঝোঁক একটু বেশি।

মেহরাজ আস্তে করে দাদুভায়ের বুকের ওপর মেলে রাখা বইটি উঠিয়ে ডাক দিল, দাদুভাই!...

ডাকটি তেমন জোরের ছিল না। ভেবেছিল, ঘুমিয়ে গেলে তাকে আর ডাকবে না। কিন্তু অবাক কাণ্ড!

সামান্য শব্দেই তিনি জেগে গেলেন। তারপর কেমন স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, কি দাদুভাই! কখন এলে?

দাদুর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মেহরাজ উত্তর দিল, এইতো এখন।

– যাও। হাতমুখ ধুয়ে, অযু করে এশার নামাযটা আদায় করে নাও। আমিও নামায পড়বো– বলে তিনি উঠে বসলেন।

মেহরাজ উঠতে উঠতে বললো, আমি অযুর পানি দিয়ে যাচ্ছি। বারান্দায় বসে অযু করে নিন। আমি মসজিদে যাচ্ছি। এসে একসাথে খাব কিন্তু।...

– ঠিক আছে, যাও। বলে দাদুভাই একটু হাসলেন।

www.pathagar.com

দুই.

আজকাল রাতে আর তেমন একটানা ঘুম হয় না জাফরী সাহেবের।

রাতের প্রায় পুরো ভাগই জেগে থাকেন।

মাঝে মাঝে নিজের সাথেই কথা বলেন।

কখনও বা উঠোনে পায়চারি করেন আর তারাভরা আকাশ দেখেন। উদাস চোখে তাকিয়ে থাকেন মাঠের দিকে।

এত কী ভাবেন তিনি?

কেউ জানে না।

জানবার কোনো উপায়ও নেই।

তিনি বুক খুলে, মন উজাড় করে তাঁর ব্যথা-বেদনার কথা কোনোদিন বলেননি কাউকে। সবাই তাঁর কেবল ওপরের দিকটাই দেখতে পায়। কী অসাধারণ হাসিমুখি প্রাণবন্ত এক উচ্ছল মানুষ! কিন্তু তারও বুকে যে জমে আছে কষ্টের হিমালয়, তা কেইবা আর জানে?

রাত অনেক গভীর।

রুকাইয়া ঘুমিয়ে আছেন ঘরে। একাকী।

সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীরটা বিছানায় রাখতেই দু'চোখ জুড়ে নেমে আসে রাজ্যির ঘুম। তারপরও রাতে তিনি অন্তত একবার উঠবেনই। উঠে জাফরী সাহেবের মাথার কাছে এসে দরদভরা কণ্ঠে ডাকেন, আব্বাজান! কিছু লাগবে কি?

কিছু অবশ্য লাগে না।

কারণ জরুরি জিনিসপত্র তিনি শোবার আগেই শ্বশুরের মাথার কাছে রেখে দেন। তারপরও রাতে তার খোঁজখবর নেয়া উচিত বলে তিনি এমনটি করেন। আজও মধ্যরাতে একবার খোঁজ নিয়ে গেছেন।

রুকাইয়ার সেই মৃদু কথার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল মেহরাজের।

এমনিতেই আজকের ঘুমটা তেমন গাঢ় ছিল না। কেমন হালকা। বারবারই কেবল তার সামনে ভেসে উঠছিল রমিজের চেহারা। যিনি আজকের প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি ছিলেন। রমিজ তাদেরকে বলেছেন, মানুষ হতে হবে। অনেক বড় মানুষ।

'মানুষ' এই কথাটার ওপর তিনি এত জোর দিলেন যে সেটা গেঁথে গেল হৃদয়ে।

মানুষ অর্থ আলোকিত মানুষ। সেটা আবার কেমন? তিনি অবশ্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, তবুও তো ব্যাখ্যাটাই সবকিছু নয়। বাস্তব উদাহরণ হলোই আসল কথা।

www.pathagar.com

বালিশে মাথা রেখে এপাশ-ওপাশ করছে মেহরাজ।

নাহ! ঘুমটা আর এলনা। শুয়ে আছে অথচ চোখে ঘুম নেই, এটা দারুণ কষ্টকর অবস্থা। পরীক্ষার সময়গুলো তবুও একরকম ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। রাত জেগে লেখাপড়া করেই সময়গুলো পার করা গেছে। এখন যেন সময় কাটতেই চাইছে না। সে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো। একটা দীর্ঘ হাই তুলে ও ঘরের বারান্দার দিকে তাকালো। না, দাদুভাই বিছানায় নেই।

দাদুভাইকে বিছানায় না দেখে মেহরাজ প্রথমত একটু হোঁচট খেল, কী ব্যাপার! দাদুভাই গেলেন কোথায়? তারপর নিজেই আবার নিশ্চিত হল, নিশ্চয়ই পেছনের উঠোনে দাদুভাই একাকী পায়চারি করছেন।

বারান্দা থেকে নেমে পড়লো মেহরাজ।

এক পা দু' পা করে এগিয়ে গেল পেছনের উঠোনে।

উঠোনের সামনে দিয়ে একটি রাস্তা।

রাস্তাটি চলে গেছে পূবের মাঠে।

রাস্তার সাথে লাগোয়া টিউবওয়েল।

কল চাপার শব্দ হল।

মেহরাজ দ্রুত এগিয়ে গেল কলের কাছে। সে চমকে উঠলো। বললো, আহা করছেন কি দাদুভাই! আপনি কল চাপছেন কেন? আমার কাছে দিন।

মেহরাজ কল চাপছে আর দাদুভাই কলের মুখে বদনা পেতে পানি ভরছেন।

তার কোনো দরকারই ছিল না। অবশ্য মাথার কাছেই তো বদনা, জগ, গ-াস, কুলুখের মাটি, পানের ডালি, হারিকেন- সবই রাখা আছে। যে কোনো প্রয়োজন সহজেই মেটাতে পারেন তিনি, তবুও কেন তিনি পানির জন্য কলপাড়ে এলেন?

মেহরাজ কিছুটা অপ্রস্তুত হল। তবে কি আম্মা আজ দাদুর শিয়রে এসব দরকারি জিনিস রাখতে ভুলে গেছেন? তাইবা কেমন করে হয়! এমন ভুল তো তিনি কখনো করেন না?

মেহরাজের কণ্ঠে বিস্ময়। জিজ্ঞেস করলো, এত রাতে আপনি একা কলপাড়ে এলেন কেন দাদুভাই?

বদনাটি নিয়ে উঠোনের পাশে বসে পড়লেন জাফরী সাহেব।

তিনি এখন অযু করবেন। বদনাটির গলায় হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। মেহরাজের কথায় তার দিকে মনোযোগী হলেন। বললেন, চোখে তো ঘুম আসে না! সময়গুলো কাটাই কীভাবে? তাই হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম এদিকে। ভাব-লাম অযু করে তাহাজ্জুদটা আদায় করে নিই। তা তুমি ঘুমাওনি কেন দাদুভাই?

www.pathagar.com

- আমারও আজ ঘুম আসছে না।

- কেন?

- কী জানি?

- কোন সমস্যা হচ্ছে দাদুভাই?

- না তেমন কিছু না।

- কথা লুকাবার বৃথা চেষ্টা কর না দাদুভাই! জানই তো আমার দৃষ্টি আর অনুভূতি পাতালের গভীরেও পরিভ্রমণ করে!

হাসলো মেহরাজ। বললো, জানবো না মানে? আপনার চোখকে ফাঁকি দিতে পারি এমন সাধ্য আর যোগ্যতা আমার কোথায়?

বদনা রেখে উঠে দাঁড়ালেন জাফরী সাহেব।

ধীরে পায়ে এগিয়ে এলেন।

মেহরাজের মাথায় হাত রেখে বললেন, তাহলে বলে ফেল দাদুভাই, সমস্যাটা কোথায়?

দাদুভায়ের হাতের স্পর্শে মেহরাজের দেহ-মনে এক ধরনের নির্ভরতার আরামের শীতল বাতাস বয়ে গেল। তার খুব ভাল লাগছে।

লাগবে না কেন? তিনি তো কখনও তাকে আব্বার অভাব বুঝতে দেননি!

মেহরাজ খুব আস্তে করে ডাকলো, দাদুভাই!

- বলো।

মেহরাজ চুপ। তার যেন গলাটা ধরে আসছে।

দাদুভায়ের বুঝতে বাকি থাকে না যে, মেহরাজ কিছু বলতে চায়। তিনি অভয় দিয়ে বললেন, কি বলবে বলো না!

মেহরাজ আকাশের দিকে তাকালো।

কী সুন্দর ধবধবে জোছনা। আকাশ ভরা তারার মেলা। সে দিকে তাকালে মনটা এমনিতেই হালকা হয়ে যায়।

দাদুভাই আবার জিজ্ঞেস করলেন, কই বলো!

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো মেহরাজ। বললো, দাদুভাই আজ বাজারে আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল।

সেটা শুনেছি তোমার মায়ের কাছে। তারপর বলো।

- সেখানে ছিলেন আমাদের রমিজ ভাই। তিনি 'আলোকিত মানুষ' হবার জন্য আমাদেরকে বললেন। আলোকিত মানুষ কি, দাদুভাই?

www.pathagar.com

আলোকিত মানুষ? হাসলেন দাদুভাই। বললেন, যে মানুষ আলোকিত করে– নিজের মন, চরিত্র, জীবনধারা, পরিবার, সমাজ, দেশ এবং জগতকে– সেইতো আলোকিত মানুষ।

- কাজটি অনেক কঠিন, তাইনা দাদুভাই?

- কঠিন কিন্তু সাধ্যের বাইরে নয়। চেষ্টা করলে সম্ভব, খুবই সম্ভব।

- ইচ্ছা করে তেমন একজন মানুষ হতে। স্বপ্নটা দেখি বটে, কিন্তু বড্ড ভয় করে।

- ভয় কেন?

- যদি পেরে না উঠি?

- কেন পারবে না দাদুভাই? তোমার চোখে মুখে আমি পেরে ওঠার সেই বিদ্যুৎচ্ছটা চমকে উঠতে দেখছি। এখন প্রয়োজন কেবল কঠিন অনুশীলন।

- দাদুভাই!

- বলো।

- আপনার মত এত শক্তি পাব কোথায়?

- আমার মধ্যে আর কীই বা শক্তি আছে? তবে শক্তি বলতে যদি বলো মানসিক শক্তি, তাহলে অবশ্য সেটা আমার মধ্যে এখনও আছে। জানই তো, তারুণ্যই শক্তি। ভেতরের সেই তারুণ্য শেষ তো সবই শেষ। তোমার আব্বার মধ্যেও সেটা ছিল। বরং আমার চেয়েও কিছুটা বেশি ছিল।

- আব্বার মধ্যে তেমন শক্তি ছিল?

- ছিল মানে? তার মধ্যে যে কী পরিমাণ ইচ্ছা শক্তি এবং সাধনার অদম্য স্পৃহা ছিল তা বলে বুঝানোর মত নয়।

www.pathagar.com

তিন.

মেহরাজ অবাক হয়ে শুনছে দাদুভায়ের কথা।

দাদুভাই আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, জানো! তোমার আব্বা শরিফ, ছোট্টকালে আমার সাথে বাজারে যেত। তখন তো আর বাজারের অবস্থা আজকের মত ঝলমলে ছিল না। বাজারে কয়েকটি মাত্র বিল্ডিং ছিল। এ মাথায় ছিল বিশাল এক শিশুগাছ। সারি সারি ছিল কিছু টিনের দোকান। আর একটি মাত্র ছিল চায়ের দোকান। তাও খড়ের ছাউনি। নদীর কিনার ঘেঁষে বসতো ছাগল, গরুর হাট। শীতকালে গুড়ের হাট। আর মাছের বাজার ছিল ভিতরে। তাও ছোট্ট। সন্ধ্যায় সবাই কেরোসিনের কুপি জ্বালাতো দোকানে। বড়জোর হারিকেন। একটি মাত্র মুদির দোকান একটু বড় ছিল। নগেন ময়রার দোকান। সেখানে জ্বলতো হ্যাজাক। সারা বাজার ছিল কাঁচা। বর্ষাকালে কাদা আর অন্যসময়ে ধুলো– এই তো ছিল বাজারের অবস্থা। সপ্তাহে শনি ও মঙ্গলবারে হাট বসতো। বহুদূর থেকে মানুষ তাদের সপ্তাহের বাজারের জন্য হাটে আসতো। আমার সাথে শরিফও যেত। ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে যেতাম এই মাথার শিশু তলায়। আমি বাজার সেরে তারপর ফিরে আসতাম ওর কাছে। দেখতাম ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার চারপাশ কেবল আঁকিবুকি। কখনো সে-ই আমাকে ডেকে বলতো, দেখুন তো আব্বাজান কেমন হয়েছে?

সেদিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে যেতাম।

ধুলোর ওপর শরিফ হয়তো লিখেছে নদীর নাম, নয়তো পাখির নাম, নয়তো পশুর নাম, নয়তো দোকানের সাইন বোর্ডের নকল ইত্যাদি। জিজ্ঞেস করতাম, কি দিয়ে লিখেছ?

- কেন পায়ের আঙুল দিয়ে!

- সেটা কেমন করে?

- এইযে এইভাবে। বলে শরিফ দাঁড়িয়ে থেকে ধুলোর ওপর পায়ের আঙুল ঘুরিয়ে তার নাম লিখে দেখাতো। আহ কী চমৎকার ছিল তার হাতের লেখা! সাইন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে ঠিক সেই রকম পায়ের আঙুল দিয়ে লেখার চেষ্টা করতো। সে এক ভারি মজার দৃশ্য! তোমার আব্বাজান, বুঝলে– দাদুভাই একটু থামলেন। তারপর আকাশের আদম সুরাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঐ যে তারাটা দেখছো, এটাকে বলে আদম সুরাত। তোমার আব্বা রমজানের সময় রাতে আগেভাগে উঠে পড়তো। বাড়িতে তখন কোনো ঘড়ি ছিল না। শুধু আমাদের বাড়িতে কেন, এই তল-াটে কোথাও ঘড়ি ছিল না। তো তোমার আব্বা ঐ আদম সুরাত দেখে সেহরীর জন্যে আমাদেরকে ডাকতো। আমরা সেহরী করতে বসলে সে কেমন টুক করে বের করে দিত পাকা টসটসে নারকেলের বরুই।

www.pathagar.com

বরুই!

- হ্যা, বরুই, তো আর বলছি কি?

- তিনি কোথায় পেতেন?

- পাবে আর কোথায়? গাছের নিচে? ঐ যে আমাদের উঠোনে, যেখানে এখন নারকেল গাছ, ঐখানে ছিল একটি বড় কুলগাছ। তুমিতো আর দেখনি সে গাছ। আহ কী বড় ছিল, আর কী মিষ্টি ছিল তার কুল! বাদুড় বসতো রাতে। টুপ টাপ করে পড়তো পাকা কুল। শীতের রাত। তা যত শীতই পড়ুক না কেন, সবার আগে শরিফ উঠে সেগুলো কুড়িয়ে আনতো হারিকেনের আলোয়। তারপর ধুয়ে যত্ন করে থালায় তুলে রাখতো। আমরা সবাই উঠলে সেগুলো আমাদের সামনে আনতো। সবাই মিলে সেহরীর সময় কুল খেয়ে তৃপ্ত হতাম।

মেহরাজ অবাক হয়ে শুনছে তার আব্বার কথা। শুনছে আর তার বুকের ভেতর কী যে এক দোলা, কী যে এক শিহরণ টোকা দিয়ে যাচ্ছে!

কেন যাবে না? নিজের আব্বার কথা শুনেত কার না ভাল লাগে! সেই যে মানুষ, সোনার মানুষ, সেই মানুষটির আদর সোহাগ, ভালবাসা আর স্নেহ থেকে বঞ্চিত সে। কষ্ট যে লাগে না তা নয়। পিতার অভাব, মায়ের অভাব- এসব অভাব যে পৃথিবীর অন্য কোনো কিছুতেই পূরণ হবার নয়।

মেহরাজের বুকের ভেতর একটা শূন্য হাহাকারের ধ্বনি কেবলই গুমরে ওঠে। অনেক কষ্টে সেটা চেপে রেখে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা দাদুভাই! আব্বার কী হয়েছিল? আমার তখন বয়স কত?

দাদুভাই আবার যেন স্থির হয়ে গেলেন।

এযে বড় কঠিন প্রশ্ন। কঠিন জবাব। নিজের সন্তানের রক্ত, মৃত্যু, লাশ, দাফন, কবর-এর মত আর কোন্ কঠিন এবং ভারী জিনিস আছে একজন পিতার জন্যে, এই পৃথিবীতে?

দাদুভাই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মাথাটি কেবলই ঘুরছে আকাশের চারপাশে।

মুখে কোনো কথা নেই।

নীরব, নিশ্চুপ।

মেহরাজও প্রশ্নটা করার পর বুঝলো, এই রাতে প্রশ্নটা না করাই তার ভাল ছিল। কিন্তু এটা এমনই এক ব্যাপার যে, চাইলেই চেপে রাখা যায় না। দাদুভায়ের জন্যে এখন তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

দাদুভাই বলে কথা।

দাদুভাই!

এই এক মহৎ মানুষ বটে!

তিনি পাষাণে বুক বেঁধে সকল কষ্ট, সকল ব্যথা, যন্ত্রণা, সকল শোক কেমন হজম

www.pathagar.com

করে নিয়েছেন।

তিনি বুঝেছেন, যেহেতু মানুষ– সে কারণেই হাসি-কান্না, শোক-তাপ, উত্থান-পতন সবই আছে। আর এসব নিয়েই তো জীবন। সকল অবস্থায় তাই ধৈর্যের সাথে আল-াহর ওপর ভরসা করাই হল মানুষের কাজ। ইচ্ছা করলে প্রশ্নটি তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু গেলেন না। সত্য যত কঠিনই হোক, সেটা সত্য। তিনি কেন চেপে যাবেন? হায়াত, মৃত্যু, রিজিক কোনোটাই তো মানুষের হাতে নেই। এসব কিছুর নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল-াহ। কীসে বান্দার কল্যাণ আছে সে তো কেবল আল-াহ পাকই একমাত্র ভাল জানেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যেও কোনো কল্যাণ আছে, যা আমরা বুঝতে অক্ষম।

দাদুভাই এবার বদনার ওপর হাত রেখে বসলেন।

মেহরাজকেও বসতে বললেন।

উঠোনের সামনে, রাস্তার পাশে ঘন সবুজ ঘাস। ঘাসের ওপর দু'জন মুখোমুখি বসে আছে। দাদুভাই বললেন, তোমার মা জেগে গেলে কিন্তু বকবেন।

মেহরাজের কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়। বললো, না বকবেন না।

- বাহ! রাত জেগে দুইভাই গল্প করছি, আর তিনি বকবেন না?

- মোটেও না। কারণ, আম্মা জানেন আমি রাত জাগতে পারি। আর এটা যে মোটেও গল্পের আসর নয়, অনিবার্য জীবনের পাঠ– তা কি তিনি বুঝবেন না?

– হ্যা, তাইতো।

মেহরাজ বললো, এই যে আপনি জীবন থেকে, প্রকৃতি থেকে, মানুষ থেকে এতকিছু শিখেছেন, এর কি কোনো তুলনা হয়? এই শিক্ষা কি কেবল বই পড়ে অর্জন করা সম্ভব? আমিও কি বই থেকে এসব মণি-মাণিক্য শিখতে পারব? জীবনের এই শিক্ষাই তো প্রকৃত শিক্ষা। তরতাজা আর বাস্তব।

- ঠিকই বলেছ দাদুভাই, জীবনের পাঠশালাই বড় সমৃদ্ধ পাঠশালা। কেউ এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, আবার কেউ হয়তো বা পারে না। যারা পারে তারা সফল হয়। আরা যারা পারে না তারাই ব্যর্থ হয়।

- ঠিকই বলেছেন।

দাদুভাই এবার আরও ঘন হয়ে বসলেন।

দু'জনের মাঝখানে তেমন কোনো ফাঁক নেই। বললেন, তোমার আব্বার কথা জানতে চাইছিলে না?

- হ্যা। তাঁর মৃত্যুর কথা!

- সেটা তো অনেকবারই জানতে চেয়েছো। জানি, তবুও তুমি বারবারই ওটা শুনতে চাইবে। সেটাই তো স্বাভাবিক।

- জ্বি।

- সে কথা আবারও শোনা যাবে। বলবো। তার আগে আরও কিছু কথা শোনো।

www.pathagar.com

- কী?

- এই তার জীবন এবং স্বভাব সম্পর্কে। বলবো?

- অবশ্যই। বলুন দাদুভাই।

- একবার হয়েছে কি জানো?

– কী?

দাদুভাই ফিক করে হেসে দিলেন। বললেন, শরিফ তখন লিখতো তালপাতায়। সুলেখা কালি গুলিয়ে কঞ্চির কলম দিয়ে। আমি কলম বানিয়ে দিতাম। একবার আমি বাড়িতে ছিলাম না। ওর কালিও ফুরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখলাম, ওর লেখাগুলো একটু পানসে অন্যরকম কালিতে লেখা। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোন্ কালি? শরিফ বললো, দোয়াতে কালি ছিল না, কি করবো? সিমের পাতা পিষে কালি বানিয়ে নিয়েছি। আমি তো শুনেই হতবাক! সিমের পাতা পিষে কালি বানিয়ে সেই কালি দিয়ে লিখেছে আমার ছেলে! সেদিন কী যে খুশি হয়েছিলাম ওর কাজে, বুঝাতে পারবো না।

মেরহাজের চোখে মুখেও খুশির ফোয়ারা। বললো, চমৎকার তো! একটা নতুন জিনিস শিখলাম।

দাদুভাই হাসলেন, বললেন, অবশ্য এখন এসব তোমাদের জন্যে দরকারও হয় না। এখন তো বর্ণ পরিচয় হয় অন্যভাবে। লেখা শুরু করতে না করতেই হাতে কলম উঠে যায়। তখন এমনটি ছিল না। শরিফ তো বর্ণ লেখা শিখেছে প্রায় বলতে গেলে উঠোনেই। ধুলো-মাটির ওপর তারপর স্লে-ট, চক।

- সেটা আবার কেমন?

- বুঝলে না? শরিফ করতো কি! উঠোনে বসে ধুলোর ওপর আঙুল দিয়ে, কখনো বা পাটকাঠি দিয়ে লিখতো অ, আ, ক, খ। বারবার লিখতো। বিভিন্নভাবে লিখতো। লিখতো আবার হাত দিয়ে মুছে সমান করে দিত। আবার লিখতো। আবার হাত দিয়ে সমান করে দিত। আবার লিখতো আবার মুছতো। এভাবেই চলতো ওর লেখার খেলা। আমি খুব খেয়াল করে দেখতাম। মাঝে মাঝে আমার কাছেও জিজ্ঞেস করতো বিভিন্ন বর্ণ লেখা কৌশল সম্পর্কে। বলতে গেলে স্লে-ট, চক দিয়ে সে খুব কমই লিখেছে। আর কলম? ক্লাস এইটে ওঠার পর ওকে একটি ঝরনা কলম কিনে দিয়েছিলাম।...

- হ্যা, কলমটি একবার দেখেছিলাম আম্মার বাক্সে।

- ঐতো সেটাই। পরে অবশ্য অনেক কলমই কিনে দিয়েছি, সেও কিনেছে। কিন্তু প্রথম কেনা কলমটি সে কখনো নষ্ট করেনি। ওর আবার সংরক্ষণের একটা অভ্যাস ছিল। মনে করতো কোনো কিছুই ফেল্না নয়।

- তা ঠিক। আব্বাজানের বই-পত্রের মধ্যে অনেক পুরনো সব কাগজপত্রও দেখেছি। তিন পুরুষের হস্তলিপি এবং খাতাপত্রও। হয়তো আমি হলে সেসব নষ্ট

www.pathagar.com

করে ফেলতাম। কিন্তু তিনি তা করেননি। কেমন যত্নের সাথে সেসব গুছিয়ে রেখেছেন।

দাদুভাই হাসলেন। তা যা বলেছ। তোমার আব্বা সেভেনে উঠেই কবিতা, গান লেখা শুরু করেছিল। লিখতও বেশ। আমাকে শুনাতো। আমি ওকে উৎসাহ দিতাম। তার লেখা একটা গানের অংশ শুনবে?

- কেন নয়? শোনান না দাদুভাই

- শোনো তাহলে। দাদুভাই সুর করে আস্তে আস্তে গাইলেন :

"জীবনটা যে অনেক বড়ো
তাই বলে তো জড়োসড়ো
হলে চলবে না,
ঠিক রাখবে ঘরের চাল
শক্ত হাতে ধরবে হাল
বিপদ বাধায় টললে চলবে না।"

মেহরাজ খুশিতে ডগমগ করে উঠলো।

দাদুভায়ের গলায় এই শেষ রাতে গানটি এমন ভাল লাগলো যে উত্তেজনায় সে বলে উঠলো, আর একটা দাদুভাই পি-জ!

নিজের সন্তানের লেখা। আবার শ্রোতা তারই সন্তান। এ এক অন্যরকম আবেগের ব্যাপার। কারুরই তো ক্লান্ত হবার কথা নয়। একজনের সন্তান, অন্যজনের পিতা। তাকেই ঘিরে যখন মজমা তখন আর থামার কথা আসে কী করে? দাদুভাই বললেন, শোনো তাহলে আর একটি লাইন। দাদুভাই সুর করে গাইতে থাকলেন :

"রক্ত-পাথরে ভেসেছি কত
জীবনের কথা ভাবিনি
এসেছে ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্র বৃষ্টি
তবুও আমরা থামিনি।"...

দাদুভায়ের গানের রেশটুকু শেষ না হতেই বাড়ির ভেতর থেকে মোরগের ডাক ভেসে এল, কোঁ-কোর-কোঁ...

দাদুভাই বদনা হাতে করে উঠলেন। বললেন, অনেক হয়েছে দাদু! ফজর হয়ে গেল। মসজিদে যাবার জন্য এখন প্রস্তুতি নাও।

মেহরাজও উঠে দাঁড়াল।

দুই হাত দুইদিকে মেলে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো।

আড়মোড়া নয়, সেও যেন পৃথিবীর দুইপ্রান্তে মেলে দিতে চায় তার দু'টি স্বপ্ন রাঙা বাহু।

www.pathagar.com

চার.

সকাল দশটা না বাজতেই সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল।

তার কিছুক্ষণ পরেই নামলো বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টি। যাকে বলে মুষল ধারায়।

বারান্দায় বসে দাদুভাই বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখছেন এক দৃষ্টিতে।

মেহরাজ মাঠে গিয়েছিল গরু বাঁধতে। বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে সে দৌড়ে বাড়িতে এল।

মেহরাজকে দেখে দাদুভাই হাসলেন। বললেন, বৃষ্টিতে ভিজতে কেমন লাগছে?

- খুব ভাল। বলে মেহরাজ আবার দৌড় দিল পুকুরের দিকে।

রুকাইয়া দ্রুত কাজ করছেন।

উঠোনে কত কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বৃষ্টিতে সবই এলোমেলো হয়ে গেল।

জাফরী সাহেব বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে বললেন, বউমা! বেশি ভিজো না! অসুখ করবে।

কাজ করতে করতে রুকাইয়া বললেন, আপনার কথাই সত্যি হলো আব্বাজান। ঠিকই বৃষ্টি হচ্ছে।

হাসলেন জাফরী সাহেব। তাঁর চোখে-মুখে যেন বিজয়ের আনন্দ। বললেন, বলেছিলাম অনুমান করে। কাল আকাশে সেই রকমই সম্ভাবনা ছিল।

বৃষ্টিতে কাজ করতে কষ্ট হচ্ছে রুকাইয়ার। তারপরও শ্বশুরের অভিজ্ঞতার সাফল্যে তিনিও গর্বিত। হাসতে হাসতে বললেন, আপনার ধারণার কোনো তুলনা হয় না আব্বাজান!

- এ আর তেমন কি? হাসলেন জাফরী সাহেব।

- তেমন না মানে? সেই কবে থেকে দেখে আসছি। যা বলেন, তার প্রায় সবই ঘটে যায়।

রুকাইয়ার স্বীকৃতিতে জাফরী সাহেব খুব খুশি। তার কৃতজ্ঞবোধে আনন্দিত হলেন।

পুকুর থেকে গোসল করে মেহরাজ দ্রুত ফিরে এসেছে।

কাপড় বদলে বারান্দায় দাদুভায়ের কাছে এসে বসলো। বললো, বৃষ্টিতে ভিজলাম। না জানি আবার সর্দি-জ্বরে পড়ি কিনা।

জাফরী সাহেবের ঠোঁটে বাঁকা হাসি। বললেন, 'লাগলে মাথায় বৃষ্টি বাতাস, উল্টে কি যায় সৃষ্টি আকাশ? রোদের ভয়ে থাকলে শুয়ে-রে নৌকা বাইবে কারা?'

www.pathagar.com

–পড়েছ? পড়েছ কবিতাটি?

- হ্যা পড়েছি দাদুভাই।

- তবে ভয় পাচ্ছ কেন? তোমরা গ্রামের ছেলে। কাদা-মাটি, ঝড়-বৃষ্টি, রোদ তাপ এসবের ভয় করলে চলে? মাটির সাথে সখ্যতা গড়ো। মাটিকে ভালবাস। দেখবে সবই সয়ে গেছে।

- তবুও দাদুভাই, অভ্যাস বলে একটা কথা আছে না!

- ওসব কিছু না। মনের ইচ্ছা থাকলেই হয়। আমি যখন শহরে চাকরি করতাম, তখনও প্রতি সপ্তাহে বাড়ি আসতাম। আর উঠোনে পা দিয়েই আগে ভাবতাম মাঠের কথা। যতটুকু সময় পেতাম- তার প্রায় পুরোটাই মাঠে কাটিয়ে দিতাম। ফসলের সাথে কথা বলতাম। বৃক্ষের সাথে কথা বলতাম। ঘাস, পাখি, বাতাস এসবের সাথে গল্প করতাম। এ নিয়ে তোমার আব্বা আর আম্মাও আমাকে ভর্ৎসনা করতেন। একটু বাড়ি এসেই কেন আমি মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াই, তাদেরকে কেন বেশি সময় দেই না, কেন বিশ্রাম করি না। এসব নিয়ে তাদের অভিযোগ ছিল। কিন্তু আমি পারতাম না কাদা-মাটি আর ফসলের ক্ষেত থেকে নিজেকে দূরে রাখতে।
এখনও মনটা আনচান করে। আহ্ যদি ছুটে যেতে পারতাম পুবের মাঠে ধানের ক্ষেতে, পাটের ক্ষেতে কিংবা নোচুর কুড়ে?

- মেহরাজ একটু খোঁচা দিয়ে বললো, আমার মনে হয় এখনও পারেন। যান না ছুটে!

- আমাকে চ্যালেঞ্জ করছো? চশমার ফাঁক দিয়ে আড় চোখে তাকালেন দাদুভাই।

- তা না দাদুভাই, তবে–

- তবে আবার কি হে! জান, আমি রাস্তায় হাঁটলে কেউ আমাকে পিছে ফেলতে পারতো না। বরং আমিই কাউকে আগে যেতে দিতাম না। এত দ্রুত হাঁটতে পারতাম। আর এখন তো তোমরা হাঁটতেই শিখলে না। যেভাবে পা ফেল, তাতে করে মনে হয় পড়ে যাবে। কী শংকা, কী দ্বিধা!
রুকাইয়া উঠোনে ঝাড়ু দিয়ে পানি সরিয়ে দিচ্ছিলেন। কথাটা তার কানে গেল। তিনি মাথা তুলে ঝাড়ুটি হাতে নিয়ে হেসে বললেন, আপনার কি মনে আছে আব্বাজান, ঐ যে সেবার...

- কোন্ বারের কথা বলছো বউমা!

- কেন, ঐ যে, মেহরাজের বয়স যখন চার বছর তখন ও পা ফেলতো থপ, থপ করে, ভয়ে ভয়ে...

www.pathagar.com

- হ্যা, তারপর যেন কি?

- আমরা তো তখন ঢাকায় থাকতাম আপনার ছেলের সাথে। সেবার বাড়ি এলে আপনি আমাকে বললেন, দাদুভাইকে উদোম করে উঠোনে ছেড়ে দাও। তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি ইতস্তত করলে আপনি বললেন, মাটির পরশ, বৃষ্টির ছোঁয়া আর খোলা উঠোন না পেলে তোমার ছেলে হাঁটতে শিখবে কেমন করে?

আমি বললাম, পা পিছলে যদি ও পড়ে যায়?

আপনি বললেন, তা যাক। পড়ুক, আছাড় খাক। ব্যথা পাক। আবার উঠতে চেষ্টা করুক। তারপর হাঁটুক। দৌড়াক। ওর জন্যে জায়গা না দিলে ও দৌড়ুতে পারবে কেমন করে? এভাবেই তো ও একদিন প্রকৃত অর্থে উঠে দাঁড়াবে, হাঁটবে এবং ছুটবে।

আমার দ্বিধা দেখে আপনিই ওর জামা প্যান্ট খুলে উঠোনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর মেহরাজ কেমন সারা উঠোন দাবড়িয়ে বেড়িয়েছিল সেদিন। বিষয়টি যখনই মনে পড়ে তখনই আমার হাসি পায়।

- এটা হাসবার মত বিষয় বটে। তবে মাগো, এর মধ্যে শেখার অনেক কিছু আছে।

- নিশ্চয়ই।

দাদুভাই এবং আম্মার কথা শুনতে মেহরাজের মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। বিশেষ করে উদোম হবার কথায়। সে মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

দাদুভাই বললেন, কি হে! এসব কথা কি তোমার মনে আছে?

আম্মা আবার উঠোনের অন্য প্রান্তে চলে গেছেন ঝাড়ু হাতে।

নারকেলের শুকনো ডাল ভেঙে পড়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে শিশুপাতা এবং নারকেলের পাতা। বৃষ্টির পানিতে সব ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। আম্মা পরম যত্নে সেসব গুছিয়ে তুলছেন।

সামনে পলগাদা। বৃষ্টির সময়ে পলগাদা থেকে ভাপ ওঠে। সেই এক আশ্চর্য দৃশ্য! পলের ভেতরের গরম বেরিয়ে আসার কারণে এই ভাপ। এটাও দাদুভায়ের কাছে জেনেছে মেহরাজ। যেমন সে জেনেছে এক শীতের রাতে, দাদুভাই বলেছিলেন– শীতকালে গরম কাপড় কিংবা লেপ গায়ে দিলে শীত লাগে না কেন। বলেছিলেন, শরীরের উত্তাপ ঐসব কাপড় ধরে রাখে বলেই শরীর গরম থাকে। শীতে কষ্ট পেতে হয় না। আসলে কাপড় গরম নয়। গরম থাকে শরীর। বিষয়টি সাধারণ মনে হলেও ঐ বয়সে মেহরাজের কাছে একটি বৈজ্ঞানিক দর্শন বলে মনে হয়েছিল। দাদুভায়ের এ ধরনের কতো কথাই যে তার হৃদয়ে গেঁথে আছে!

www.pathagar.com

বৃষ্টির ধরনটা অন্যরকম।

খুব সহসা থামার কোনো আলামত দেখা যাচ্ছে না।

মেহরাজ জিজ্ঞেস করলো, দাদুভাই! বৃষ্টি কতক্ষণ চলবে বলে মনে হয়?

দাদুভাই বারান্দায় বসে চালের নিচ দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখে নিলেন আকাশের গতি-প্রকৃতি। তারপর বললেন, বেশিক্ষণ সম্ভবত থাকবে না। তবে মাঝে মাঝেই আজ বৃষ্টি হতে পারে। তুমি একটা কাজ কর দাদুভাই, আমাকে একটি বৃষ্টির কবিতা শোনাও।

-কবিতা? তাও আবার বৃষ্টির?

- হ্যা, কেন, মনে নেই? যদি না পার তাহলে আমাকেই বলতে হবে।

এই মুহূর্তে হারতে ইচ্ছে করছে না মেহরাজের। একটু ভেবে নিয়ে বললো, তবে শোনাই!

- অবশ্যই।

মেহরাজ বাদলা দিনের কবিতা আবৃত্তি শুরু করলো :

আকাশটাকে দেখতে লাগে মস্তবড় থালা
বাদলা দিনে হাওয়ায় ভেসে কাঁদছে নাকি খালা?
গোমড়া মুখে আঁচল টেনে মেঘটা হলো নীল,
বইয়ের পাতা রঙিন ছাতা, বর্ণগুলো চিল।
খোলা মাঠের বৃষ্টিধারা ঢা' গুড় গুড় ঢাক্।
দেখতে যেন স্বর্ণ-পুঁটি, ইলশেগুঁড়ির ঝাঁক।
মা-মনিটা ঘুমায় ঘরে আঁচল মুড়ি দিয়ে,
আমি কেবল ভাবছি বসে- হতাম যদি টিয়ে!
টিয়ে হলেই যেতাম উড়ে মেঘ-ময়ূরী গাঁয়,
কিংবা শুধু যেতাম ভেসে সিন্দাবাদের নায়।
পাখিও নই, পরীও নই- পয়ার পাব কই?
তাইতো আমি খোকন হয়ে দাওয়ায় বসে রই।

- চমৎকার! চমৎকার!

দাদুভায়ের সারা শরীর দিয়ে যেন খুশির ঢেউ আছড়ে পড়ছে। বললেন, এমন সুন্দর কবিতা বহুদিন শুনিনি। এখন কিছু ঝাল-পেঁয়াজ মাখা মুড়ি পেলে জমতো ভাল। বলবে তোমার মাকে? না থাক। তুমিই বরং ম্যানেজ করে আন।

একটা পে-টে মুড়ি। পেঁয়াজ, ঝাল আর সরিষার তেল দিয়ে মাখা। মুড়ির ঘ্রাণে

www.pathagar.com

চকচক করে উঠলো দাদুর চোখ। খেতে খেতে বললেন তোমার আব্বাজানও ভাল আবৃত্তি করতো। কণ্ঠটি ছিল ভরাট। কিন্তু গান গাইতে পারতো না। আমিও পারিনে। আমাদের বংশের কারুরই গানের গলা নেই। কিন্তু তোমার আব্বাজান ভাল গান লিখতে পারতো। সুর বুঝতো। আর তার কানটি ছিল খুব সতর্ক- শব্দ, ছন্দ আর সুর– এসব বাজিয়ে নিতে পারতো।

আব্বার প্রসংগ আসতেই মেহরাজ চুপ হয়ে গেল।

দাদুভাইও যেন হঠাৎ কেমন থেমে গেলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, থাক ওসব কথা।

- আর একটু বলুন না দাদুভাই।

- না। আর একদিন হবে।

- আমার যে আব্বাজানের কথা শুনতে খুব ইচ্ছে করছে!

- সব সন্তানেরই তা করে। পিতা-মাতার কথা শুনতে চায়না এমন সন্তান আছে কি?

- তবে বলছেন না কেন?

- কি করে বলি? তুমি যার কথা শুনতে চাইছো, সে তোমার পিতা। কিন্তু সে যে আবার আমারই সন্তান! আমিও যে তার পিতা। আমি বেঁচে আছি। আর সে নেই। কীভাবে তার স্মৃতিচারণ করি বলতো?

বলতে বলতে দাদুভাই কেঁদে ফেললেন। তার দু'চোখ দিয়ে বৃষ্টির মত অঝোরে গড়িয়ে পড়ছে কেবল কান্নার বৃষ্টি।

একি কেবলই কান্না!

কেবলই বেদনা!

না, তার চেয়েও অধিক কিছু।

মেহরাজের মনে হলো, এই মুহূর্তে মেঘাচ্ছন্ন সমগ্র আকাশটাই যেন দাদুভায়ের চোখের ভিতর ঢুকে পড়েছে অকস্মাৎ।

মেহরাজ সান্ত্বনার কোনো ভাষা খুঁজে পেল না।

www.pathagar.com

পাঁচ.

ফজরের নামাজের পর দক্ষিণের বারান্দায় পাশাপাশি বসে কুরআন তেলাওয়াত করছেন জাফরীসাহেব আর মেহরাজ।

বেশ শব্দ করে।

ওপাশের ঘরের বারান্দায় রেহেলের ওপর কুরআন রেখে মধুর সুরে তেলাওয়াত করছেন রুকাইয়া।

কমপক্ষে আধাঘণ্টা পর্যন্ত এ বাড়িতে কুরআন তেলাওয়াত চলবে।

বিশেষ কোনো আয়াতের ব্যাপারে দাদুভাই দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন মেহরাজের। এটাও নিয়মে পরিণত হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াতের পর একটু বেলা উঠলে দাদুভাই এশরাক নামাজ আদায় করবেন। আর আম্মা নেমে যাবেন সংসারের কাজে।

পরীক্ষা শেষ হবার কারণে মেহরাজের পড়ার চাপ নেই।

তাই বলে অলস সময়ও কাটছে না। সময়গুলোকে সে কাজে লাগাচ্ছে বই পড়ে, খেত-খামারে আর বিকেলে বন্ধুদের সাথে।

বন্ধু বলতে মোহর, হাসিব এরাই।

খুবই নির্বাচিত এবং সীমিত।

দাদুভাই খুব সতর্ক মানুষ। যার-তার সাথে মেলামেশা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না।

আম্মা তো তার চেয়ে আরও বেশি সতর্ক। তিনি কখনও ধমক দেন না। সেটা অবশ্য দাদুভায়ের কারণে। ধমক, গালি, মারপিট এসব দাদুভাই একদম পছন্দ করেন না। কোনো কাজ ভাল না লাগলে কিংবা অন্যায় বা অসঙ্গতি দেখলে তিনি বুঝিয়ে বলেন।

দা'দুভায়ের এই আচরণ আর নীতি মেহরাজের খুব ভাল লাগে।

আম্মা এবং দাদুভায়ের সতর্ক ও আন্তরিক পরিচর্যায় মেহরাজও গড়ে উঠছে একটু অন্যভাবে। পাড়ার আর দশটা ছেলের মত নয়। দাদুভাই তার অবসরের গল্পের সাথী। খেলার সাথী। আর তাঁর গল্প মানেই তো অভিজ্ঞতার সমুদ্র! জ্ঞান-গরিমার দ্যুতি! নিজেকে আলোকিত করার এত উপাদান হাতের নাগালে থাকতে মেহরাজেরও ইচ্ছে করে না বাজে ছেলেদের সাথে আড্ডায় সময় নষ্ট করতে।

কুরআন তেলাওয়াত শেষ করে দাদুভাই জায়নামাজে দাঁড়িয়ে গেছেন এশরাক নামাজ আদায় করার জন্য।

এ বয়সেও তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন। এমনকি নফলও।

www.pathagar.com

মেহরাজের অনেক সময় বসে নফল নামাজ আদায় করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু পারে না। কারণ যেখানে দাদুর মত বৃদ্ধ মানুষও দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন, সেখানে তার মত জোয়ান ছেলে বসে নামাজ আদায় করবে, বিষয়টি ভাবতেই তার লজ্জা করে।

দাদুর কাছ থেকেই মেহরাজ শিখেছে চাল-চলন, আচরণ, ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়ার আদব কায়দা।

বই পড়ে এসব শেখা যায় না।

পারিবারিক পরিবেশই হল আসল।

পারিবারিক ঐতিহ্য ও শিক্ষা মানুষের যা শেখাতে পারে, সারা জীবন বই পড়েও তা শেখা যায় না।

ভদ্রতা, নম্রতা, মানবিকতা, আদব-লেহাজ এসব কি বই পড়ে শেখার মত বিষয়?

এইসব শিক্ষার মূল পাঠশালা হল পরিবার।

যাদের পরিবারের এসব শিক্ষা আছে সেসব পরিবারের সন্তানেরা গড়ে ওঠে অন্যভাবে। আর যারা সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে তারা লেখাপড়া শিখলেও মার্জিত আচরণ, সুন্দর রুচি আর প্রকৃত চরিত্র গঠনে প্রায়ই ব্যর্থ হয়ে যায়।

এদিক থেকে মেহরাজ নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করে।

তার কাছে আম্মা এবং দাদুভাই-ই এক বিশাল পাঠশালা।

এই পাঠশালার শিক্ষার সাথে পুঁথিগত শিক্ষার কোনো তুলনাই হয় না।

এশরাক নামাজ শেষে দাদুভাই ফিরলেন মেহরাজের দিকে। বললেন, আমার ওষুধ খাওয়া দরকার।

- আনছি, বলে মেহরাজ উঠতে যাচ্ছে। তার মধ্যেই রুকাইয়া হাজির। তার এক হাতে কিছু নাশতা অন্য হাতে পানির জগ। বললেন, এটা খেয়ে নিন। আমি ওষুধ আনছি।

মেহরাজ বললো, আমিই তো ওষুধটা দিতে পারতাম।

রুকাইয়া হেসে বললেন, পারতে- কিন্তু তোমার দাদুভাই চাইবার পর। আগে থেকেই তোমার খেয়াল রাখা দরকার ছিল।

মেহরাজ লজ্জিত হল।

দাদুভাই নাশতা করছেন। মেহরাজও। আম্মা পানি, ওষুধ, পান সবই এগিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আবার কাজে চলে গেলেন।

ওষুধ খাওয়ার পর দাদুভাই বাঁশের চোঙ্গা থেকে বাটাপান বার করলেন ঝাঁকি দিয়ে। হাতের তালুতে পানের দলা, লাল টকটকে। তারপর সেটা মুখে ভরে পরম তৃপ্তিতে চিবোচ্ছেন।

www.pathagar.com

দাদুর পান খাওয়ার তাছির দেখে লোভ লাগে মেহরাজের। সে তাকিয়ে থাকে দাদুর মুখের দিকে। দাদুভাই বললেন, কি হে! চলবে নাকি একটু?

- না দাদুভাই।

- খেতে চাইলে একটু নিতে পার। চোঙ্গার তলানী এখনও একটু আছে। হাসলেন তিনি।

- তলানী খাবার দরকার নেই।

- তাহলে ডালা থেকে আস্ত পান নাও।

- না।

- কেন?

- ওসব অভ্যাস করতে ইচ্ছা হয় না।

- খুব ভাল। আমিও অবশ্য চলি-শ বছর যাবত পান-টান খাইনি। ধুমপানের অভ্যাস আমাদের পরিবারে কক্ষনো ছিল না। আমার আব্বাজান-আম্মাজানকে দেখেছি পান খেতে। তাদের সাথে খেতেন আমার বড় বুবুজানও। কিন্তু আমি না। চলি-শ বছর পর একটু একটু করে অভ্যাস হয়ে গেল। এখন পেটে গ্যাস জমে। গলা-বুক জ্বালা করে। পান খেলে একটু আরাম পাই।

মেহরাজ বললো, আমার আব্বাজানও বোধ হয়!...

কথাটা শেষ করতে দিলেন না দাদুভাই। বললেন, তোমার আব্বার কথা বলছো? সে ছিল খুব শক্ত মানুষ। তেমন চরিত্রের ছেলে এখন আর দেখছি কই! পান তো দূরের কথা, এক কুঁচি সুপারির দানাও কখনও মুখে দেয়নি। তোমার আম্মাও সেই একই স্বভাবের। তবে মজার বিষয় হল- আমার পানের কথা কিন্তু তারা কখনো ভোলেনি। ঠিক সময়ে সব পেয়ে এসেছি।

মেহরাজ জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা দাদুভাই, আব্বাজান কেমন শক্ত মানুষ ছিলেন?

- কেমন? একটু হাসলেন দাদুভাই। তারপর বললেন, শোনো তাহলে- একবার, শরিফ তখন বেশ ছোট। সেই সময় সম্ভবত তোমার দাদীজান তাকে বলেছিলেন কিছু ডুমুর পেড়ে দিতে। ডুমুরের তরকারি দারুণ লাগে। ব্যস, শরিফ উঠে গেল গাছে। গাছটি ছিল ঐ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। শরিফ সম্ভবত বেখেয়াল হয়ে গাছটির মগডালে উঠে গিয়েছিল। ডুমুরের ডাল এমনিতেই নরম। তো ডুমুর পাড়তে গিয়ে সে গাছ থেকে পড়ে গেল। বেশি উঁচু থেকে না পড়ায় খুব অসুবিধা হয়নি অবশ্য। আমি বাড়িতে ছিলাম না। সন্ধ্যায় ফিরলে তোমার দাদীজান আমাকে জানালেন। আমি শরিফকে ডেকে তাকে দেখলাম। হাতে কিছুটা চোট পেয়েছে। পরে ওষুধ এনে দিয়েছিলাম। আমার সামনে সে এমনভাবে দাঁড়ালো যেন কিছুই হয়নি। তাকে বকাঝকা কিংবা ভর্ৎসনা করলাম না। শুধু বললাম, সব

www.pathagar.com

সময় সতর্ক এবং সাবধানে কাজ করতে হয়। তাহলে বিপদ-আপদ এড়িয়ে চলা যায়। ঐটুকুতেই কাজ হল। শরিফ আর কখনো বেখেয়ালের বসে কোনো কাজ করেনি। হিসাব করে পা ফেলেছে। ওকে নিয়ে আমার কখনো টেনশন, দুশ্চিন্তা কিংবা দুর্ভাবনা হয়নি। এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে?

মেহরাজ বললো, আমাকে নিয়ে কি আপনার দুশ্চিন্তা হয় দাদুভাই?

হাসলেন জাফরী সাহেব। বললেন, তা হবে কেন?

- তার মানে একটু একটু হয়!

- হয় না যে, একথা বলবো না। হয় বটে, তবে বেশি নয়।

- কেমন দুশ্চিন্তা?

- না তেমন কিছু না।

- তবুও।

- এই যেমন তোমার লেখাপড়ার ব্যাপারটি। ভাবনাটি অবশ্য আমাকে নিয়েই।

- সেটা কেমন?

একটা দীর্ঘ, লম্বা দম ফেললেন দাদুভাই। তারপর বললেন, আমার বয়স হয়েছে, এখন শুধু মৃত্যু-চিন্তা এসে ভর করছে। কবে যে হুট করে পাড়ি জমাবো পরপারে!

- দাদুভাই!

- মৃত্যু নিয়ে দুর্ভাবনা নয়। কারণ সেটা অবধারিত।

- ও প্রসঙ্গ থাক।

- প্রসঙ্গতো সেটা নয়।

- তবে?

- ভাবছিলাম তোমার লেখাপড়ার শেষটুকু আমি দেখে যেতে পারবো কিনা। আমি না থাকলে তোমার আম্মার ওপর ভীষণ চাপ পড়বে। তবুও...

- দাদুভাই!...

মেহরাজের গলটাও ধরে এল। সে কথা বলতে পারছে না।

কেমন করে বলবে? আব্বার আদর সোহাগ সে বেশি দিন পায়নি। দাদুভাই সেটা পুষিয়ে দিচ্ছেন। তিনিও যদি চলে যান তবে!... পরেরটুকু আর ভাবতে পারে না মেহরাজ। ভাবতে চায়ও না। তার চোখ দু'টো ছলছল করছে। ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো মেহরাজ।

দাদুভাই বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

- এই তো উঠোনে।

- ঠিক আছে যাও।

www.pathagar.com

বাধা দিলেন না তিনি।

রুকাইয়া রান্নাঘর থেকে বললেন, মেহরাজ! কল থেকে এক জগ পানি নিয়ে বারান্দায় বসো। আমি ভাত আনছি।

- একটু পরে খাই আম্মা!

- সে কি কথা? খাবার সময় খেতে হবে। কোনো অনিময়ই ঠিক নয়।

- আমার যে এখন খেতে ইচ্ছে করছে না আম্মা?

- বললেই হলো! বেলা হয়েছে, এখন খাবে না তো কখন খাবে? তোমার দাদুভাইও যে কষ্ট পাচ্ছেন।

দাদুভায়ের কথা বলে মেহরাজকে দুর্বল করে দেয়া আর কি।

আসলে আব্বার কথা উঠলে মেহরাজের আর কিছুই ভাল লাগে না। তারপরও দাদুর মৃত্যুর কথা তাকে আরও বেশি করে কষ্ট দিচ্ছে। তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

আম্মা আবার তাগাদা দিলেন, কি হলো, কলে যাচ্ছ নাকি?

- যাই আম্মা।

- একটু তাড়াতাড়ি কর। তোমাদের খাওয়ানোর পর আমার আবার বাইরের কাজে হাত দিতে হবে।

মা! এই এক মানুষ সংসারে।

মা'র কোনো বিশ্রাম নেই, কোনো আরাম নেই, কেবল কাজ আর কাজ। সবার জন্যই তার পেরেশানি।

জগ হাতে নিয়ে মেহরাজ কলপাড়ে গেল।

আম্মা গামলায় গরম ভাত তুলে দিতে দিতে বললেন, বিকালে বাজার করতে হবে।

জাফরী সাহেব বললেন, সে হবে। আগে বিকাল হোক তো!

খাবার মধ্যেই সাইকেলের বেলের আওয়াজ শুনে সবাই সচকিত হলো, কেউ এল বোধ হয়।

- আপনি খান, আমি দেখছি। মেহরাজ হাত ধুয়ে উঠে গেল।

আম্মাও উঁকি দিয়ে দেখলেন কে এল।

পেছনের বৈঠকখানার কাছেই শোনা গেল মেহরাজের দরাজ কণ্ঠ, আরে মোহর! তুই, এই সকালে! আয় আয় বলে– মেহরাজ তাকে নিয়ে বৈঠকখানায় বসালো।

মোহর হেসে বললো, এখন সকাল বলছিস কেন!

- বেলা কয়টা বাজে খেয়ালই ছিল না। সেই ভোর থেকে দাদুভায়ের সাথে

www.pathagar.com

বারান্দায় বসে আছি। বাইরে বেরুইনি।

- নিশ্চয়ই গল্প করছিলি!

- অই আর কি।

- তোর ভাগ্য বটে। দাদু একখান পেয়েছিস। আমার তো আবার ওসব কিছু নেই। দাদা-দাদী, নানা-নানী, মামা-মামী কিছুই নেই। থাকলে কী মজাটাই না হতো!

- তা বটে।

কথা শেষ না হতেই দাদুর গলা শোনা গেল, কে এল রে দাদুভাই?

- মোহর এসেছে।

- আমি কি তোমাদের সাথে একটু গল্পে শেয়ার করতে পারি?

মোহর হেসে জবাব দিল, কেন নয় দাদুভাই! আমাদের তো মাত্র আপনিই, একটি মাত্র দাদুভাই। আসুন আসুন, বলে মোহর জাফরী সাহেবের হাত ধরে এগিয়ে নিল।

দাদুভাই বৈঠকখানায় উঠে চেয়ারে বসেছেন। মেহরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার তাহলে দু'জনে একত্রে খেয়ে নাও।

- একত্রে মানে? আমি খেয়ে এসেছি দাদুভাই।

মোহরের কথার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে মেহরাজ উঠে দাঁড়াল, খেয়েছিস তো কী হয়েছে? খাবার পরও খাওয়া যায়। তুই বস, আমি আসছি।

মেহরাজ চলে এল। রান্নাঘরে এসে আম্মাকে বললো, মোহর এসেছে।

আম্মা দু'জনের খাবার রেডি করে দিয়ে বললেন, ওকে দুপুরে খেয়ে যেতে বলিস।

- আচ্ছা বলবো।

- ভাল করে বলিস।

- সেতো বলবই।

হাসলো মেহরাজ। আম্মা এমনিই। আম্মা মনে করেন, আন্তরিকতা, দরদ এমনি একটি বিষয়, যাকে কেউই উপেক্ষা করতে পারে না।

দু'জন খাচ্ছে। দাদুভাই চেয়ারে বসে কথা বলছেন।

মেহরাজ বললো, মোহর! আম্মা কিন্তু তোকে দুপুরে খেয়ে যেতে বলেছেন।

হাসলো মোহর। বললো, শুধুই আম্মা কেন, তুই চাইছিস না?

- ধুর! তা হবে কেন? আমি তো অবশ্যই চাইছি।

দাদুভাই খুশি হয়ে বললেন, খুব মজা হবে। দুপুরে তিনভাই এক সাথে খাব। সারাদিন গল্প করবো, কি বলো!

দাদুর কথা শুনে সবাই একসাথে হেসে উঠলো।

www.pathagar.com

ছয়.

বেলা বারটার পর মোহরকে নিয়ে গোসল করতে পুকুরে গেল মেহরাজ।

বর্ষাকাল বলে পুকুরের কানায় কানায় পানি।

পাড়ার ছেলে-মেয়েরা পুকুরের ঘাটে নেমে হৈ চৈ করছে।

গোসলের সাথে তারা পানি ছিটিয়ে খেলা করছে।

ডুব দেয়ার পাল-া দিচ্ছে।

কেউবা সাঁতার কাটছে।

উত্তরের পাড়ে একজন বৃদ্ধা নেমে পুকুরের একপাশ থেকে দুইহাতে এঁটেল মাটি খুঁড়ে মুঠো ভিজিয়ে সেই মাটি মাখছেন মাথায়। চুলের জট আর ময়লা পরিষ্কার করার জন্য! দৃশ্যটি বিরল। এখন এটা প্রায় দেখাই যায় না।

মোহর হাসল।

মেহরাজ জিজ্ঞেস করলো, হাসছিস কেন?

- পুকুরের ঐ পাশে তাকিয়ে দেখ। মাটি দিয়ে মাথা ঘঁষছেন একজন।

- এ আর এমন কি?

- তবুও এমন দৃশ্য আজকাল তো প্রায় দেখাই যায় না। সবাই এখন সাবান দিয়ে মাথা পরিষ্কার করে।

- তা করে বটে। তবে এখনও গ্রামের বয়সী মা-চাচীদের কেউ কেউ এঁটেল মাটি দিয়েই মাথা পরিষ্কার করেন।

-হ্যা, আমাদের পাড়ায়ও দু'একজনকে দেখেছি।

- এটা পুরনো ঐতিহ্য বুঝলি!

- তাতো বটেই। আমাদের বাপ-চাচারাও তো ঐ এঁটেল মাটি দিয়ে মাথা পরিষ্কার করেছেন। আমরাই না ভদ্রলোক বনে গেছি রাতারাতি।

হাসলো মেহরাজ। তা যা বলেছিস। আমরাও তো ছোট্টকালে দেখেছি কৃষকদের খালি গায়ে মাঠে হাল চাষ করতে। পরনে লুঙ্গি, তাও কাছা মারা। মাথায় টোকা, কাঁধে কিংবা কোমরে গামছা। দেখতে বেশ ভালই লাগতো। কিন্তু এখন সেইসব দৃশ্য আর নেই। সেসব দৃশ্য এখন ইতিহাসের পাতায় কেবল। সময় বদলে গেছে।

মোহর জোর দিল তার উচ্চারণে। বললো, হালের ছেলেরা মাঠে কাজ করে শার্ট-প্যান্ট পরে, পায়ে জুতা দিয়ে। লাঙ্গলের বদলে এসেছে ট্রাক্টর।

www.pathagar.com

মেহরাজ আর একটু যুক্ত করলো, ছোট্টকালে শেষ রাতে আমাদের ঘুম ভাঙতো ধানঝাড়ার শপাং শপ আওয়াজে। বিচালীর মাথাভরা ধানের বাল। সেই বিচালী ঝাড়নের ওপর বাড়ি দিলে অন্যরকম ছন্দ উঠতো। আর ঝাড়নের নিচে জমা হত রাশি রাশি সোনালী ধান।

মোহর হেসে বললো, আরে! সেই দিন কি আর এখন আছে? কোথায় সেই পাঁচ সাতটি গরু মলনে গেঁথে ধান মাড়ানোর দৃশ্য। বাড়ি বাড়ি সে কি উৎসব ভাদ্র মাসে। মনে আছে, ভাদ্র মাসের ধানের ডাঁটা দিয়ে সেই যে চমৎকার বাঁশি, আর তার যে সুর- আহ! সেই এক খেলা বটে!

মেহরাজ বললো, ছোট্টবেলা খুব খেলেছি। এখন আর সেই সব সুযোগও নেই। কারণ, ধান মাড়াইয়ের জন্য এখন এসেছে মেশিন, আউশের জায়গা দখল করেছে ইরি-বোরো।

- মোহর বললো, হ্যা, কত যে বদল। কত যে পরিবর্তন!

কথা বলতে বলতে তারা অনেক্ষণ ধরে গোসল করলো! বেশ তৃপ্তির সাথে। তারপর উঠে এল বাড়িতে।

তাদেরকে দেখে দাদু হেসে বললেন, কিহে! তোমাদের যে ফেরার কোনো নামই নেই! ভাবলাম পুকুর কেটে সেই পুকুরে গোসল করে ফিরবে।

মেহরাজ বললো, শুধু গোসল হলে তো সেই কখন শেষ হয়ে যেত।

দাদুর চোখেমুখে কৌতুক। বললেন, তবে আর কি করছিলে?

মেহরাজ বললো, গোসলের সাথে গল্পও করছিলাম যে! আর গল্পের মজমায় কি কোনো সময় জ্ঞান থাকে?

- তা বটে, তা বটে। দাদুভাই মুখ নাচিয়ে হাসলেন।

ভেতর থেকে রুকাইয়া ডাকলেন, মেহরাজ! এদিকে এস।

- জ্বি আসি আম্মা।

মেহরাজ রান্না ঘরের দরোজার মুখে দাঁড়িয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দিল ভেতরে। বললো, কিছু বলবেন?

- এখন খাবি, নাকি নামাজ আদায় করে?

- যোহর তো হয়ে গেছে। মসজিদ থেকে নামাজটা আদায় করে আসি।

- যা বেশি দেরি করিস না কিন্তু।

মোহরকে নিয়ে মেহরাজ মসজিদে যাচ্ছে।

তাদের আগে আগে যাচ্ছেন দাদুভাই। লাঠির ওপর ভর দিয়ে নয়, লাঠিটা ঘুরাতে ঘুরাতে।

www.pathagar.com

দেখতে দারুণ লাগছে দাদুকে। লম্বা জামা, হাতে ছড়ি, মাথায় সাদা টুপি, পায়ে জুতা, চোখে ভারী লেন্সের চশমা।

ধোপ দুরস্ত এক মানুষ। যাচ্ছেন মসজিদের দিকে। দৃশ্যটি মন ছুঁয়ে যায় বারবার। ক্রমাগত।

নামায শেষে খেতে বসেছে তারা।

দাদুভাই মাঝখানে। দু'পাশে দু'জন- মেহরাজ এবং মোহর।

দাদুভাই খাচ্ছেন আর কথা বলছেন। বললেন, কি আর খাবে এখন! খাবার মত কীই বা আছে? খেয়েছি তো আমরা। এই বড় জামবাঁটি ভর্তি সরওঠা ঘন দুধ, গাছের পাকা কলা, ফলফ্রুট আর সবজি-মাছ কোনটারই অভাব ছিল না। গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছ। সেইদিন কি আর এখন আছে? কিচ্ছু নেই। পাড়া-গাঁয়ে তো এখন গাছ-গাছালিও নেই। সবই ধূ ধূ।

মেহরাজ বললো, আমরাও তো দেখেছি মাঠে কত গাছ।

দাদু হাসলেন, কী আর দেখেছো? ঐ যে পুকুরের পশ্চিম এবং উত্তর পাড়টা দেখছো– এখন তো সব ঘরবাড়ি। কিন্তু আমরা ছোটকালে ওখানে ঢুকতেই সাহস করতাম না।

মোহর জিজ্ঞেস করলো, কেন?

কেন আবার। ওসব তো জঙ্গল ছিল। ঘন জঙ্গল আর গাছ-গাছালি। আমাদের সাহস হত না ওখানে যেতে।

মোহর হেসে বললো, খুব ভীতু ছিলেন বুঝি!

- ভীতু? দাদু হাসলেন। তা বলতে পার এখন। কারণ ঐ সময়টা তো তোমরা দেখনি। দেখনি কী সেই জঙ্গল, কী সেই জঙ্গলের দৃশ্য!

মেহরাজ বললো, শুনেছি ওখানে নাকি একটি তালগাছ ছিল, সেই তালগাছে সঙ্কুনী থাকতো! লম্বাচুল পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, পায়ের পাতা পিছন দিকে, দাঁত লম্বা, চোখ দুটো ইয়া বড় আগুনঝরা!...

হো হো করে হেসে উঠলেন দাদুভাই! বললেন, তা যা বলেছ। এ ধরনের ভৌতিক গল্প গাঁ-গেরামে অনেক প্রচলিত আছে। কিন্তু তার কোনো সত্যতা নেই। জিজ্ঞেস করলে সবাই বলবে, আমি অমুকের মুখে শুনেছি। তাকে জিজ্ঞেস করলে সেও বলবে, আমি অমুকের কাছে শুনেছি। এই আর কি!...

মেহরাজ বললো, তবে যে শুনেছি দরগা ডাঙার তেঁতুল গাছেও ভূত আছে। ঐ বিশাল গাছটির মধ্যে যে ফোঁকড় আছে, ওরই মধ্যে নাকি ওদের বাস! ওখানে নাকি তারা মিটিং করে, গল্প করে, হাসে, কাঁদে, আরও কত কি?...

www.pathagar.com

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, শুনেছো বটে, কিন্তু দেখেছো কি?

- না।

- তবে বিশ্বাস করলে কীভাবে?

- এমনভাবে সবাই বলে যে, অবিশ্বাসও করা যায় না।

- তবুও সত্য-মিথ্যা যাচাই করবে না? তোমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগের ছেলে। এসব ভৌতিক কথায় তোমরা বিশ্বাস করবে কেন? আমাদের সময়ে অবশ্য অনেকেই এসব বিশ্বাস করতো। কারণ তাদের সেই রকম কোনো শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না।

মোহর বললো, আমিও ঐ রকম কত কথা শুনি। মাঝে মাঝে সেইসব জায়গা দিয়ে চলার সময় গা ছমছম করে। একা তো চলতেই সাহস হয় না। মনে হয়, ঐ বুঝি তালগাছ কিংবা তেঁতুল গাছ থেকে নেমে এলো কোনো ভূত। তারপর আমার পা আগলে ধরলো। ইস্! কী সব কাণ্ড!...

দাদুভাই হেসে বললেন, এসব কিচ্ছু না। ভূত-প্রেত বলতে কিন্তু কিছুই নেই। যা আছে সে কেবল জ্বীন। তারাও থাকে তাদের মত। সুতরাং ওসব নিয়ে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

মেহরাজ বললো, তবে আপনি ভয় পেতেন কেন?

- আমি? তখন তো খুব ছোট্ট ছিলাম। তখনকার মানুষের মধ্যে ধারণাটাও ছিল ঐরকম। এছাড়া তারা এত বাড়িয়ে বলতো যে, কম বয়স হবার কারণে সত্য-মিথ্যা যাচাই করার মত সুযোগও থাকতো না। ভয় পাবার আর একটা কারণ ছিল, ঐসব জঙ্গলে বিষাক্ত সাপ আর পোকা-মাকড়ের বাস ছিল। এটা তো আর মিথ্যা হতে পারে না। তবে একটু বড় হবার পর আমি কিন্তু ভূত-প্রেতে আর কক্ষনো বিশ্বাস করিনি। আরে শিক্ষিত মানুষের কাজই তো সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা, না কি বলো?

ওরা দু'জনই একসাথে বলে উঠলো। বললো, অবশ্যই।

খাওয়া শেষ হবার পর দাদুভাই হেসে বললেন, এমন আসরে তো কবিতা ছাড়া মোটেও জমে না। কি হে মোহর দাদু, পার নাকি একটি কবিতা শোনাতে?

মোহর মাথা চুলকিয়ে বললো, পারি বৈকি! তবে আপনার সামনে বলতে ভয় করে।

দাদুভাই অভয় দিলেন। বলনে, ভয়ের কিছু নেই। শোনাও তো!

মোহর এবার শুরু করলো :

www.pathagar.com

যখন গ্রীষ্ম কাল -
ধুলো ওড়ে
ঝড়ে ভাঙে
মস্ত গাছের ডাল।

কাল বোশেখী ঝড় -
ঝরা পাতা
হাওয়ায় ওড়ে
ওড়ে চালের খড়।
ভীষণ ভয়ঙ্কর!
ঘূর্ণি ঝড়ে
আকাশ ফাটে
হৃদয় থরোথর,
ভাঙলো বুঝি ঘর!

যখন গ্রীষ্ম কাল -
ফলের রসে
টইটুম্বুর
ভিজে ওঠে গাল।

যখন গ্রীষ্ম কাল -
মেঘের ভেলা
করে খেলা
ছিঁড়ে নায়ের পাল।
বৃষ্টি যখন আসে
খড়ার মাঠে
তপ্ত হাটে
প্রাণটা তখন হাসে ॥

www.pathagar.com

মোহরের আবৃত্তি শেষ হলে দাদুভাই বলে উঠলেন মারহাবা, মারহাবা!
দাদু মেহরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার কিন্তু তোমার পালা।
মেহরাজ বললো, মাফ করলে না দাদুভাই।
মোহর বললো, না হয় না। তোকেও আবৃত্তি করতে হবে।
মেহরাজ বাধ্য ছেলের মত আবৃত্তি শুরু করলো :

ভোর সকালে হিম হিম
সারা বাংলা জুড়ে
হেমন্তের হাওয়া বেয়ে
হিমটা এলো উড়ে।

হিমটা এলো উড়ে-
কুয়াশার ছাতা মেলে
হিমালয় ঘুরে।

হিমেল ধোঁয়া ঐ যে ভাসে
গাছ-গাছালি দুর্বা হাসে
সবুজ পাতা ফুঁড়ে,
হেমন্তের চাদরখানি
সবই নিল মুড়ে।

হেমন্তের হাওয়া-
সে যে আমার বোনের নোলক
নতুন চালের ভাতের বোলক
আপন করে পাওয়া ॥

মোহর আর দাদুভাই- দু'জনই, জোরে হেসে উঠলো। মোহর বললো, দারুণ!
দাদুভাই ছড়িটা হাতে নিয়ে বললেন, এবার তাহলে আমাকে ছুটি দাও।
আমি এখন একটু শুয়ে বিশ্রাম নেব। বুঝলে, বয়স হয়েছে। এখন আর তোমাদের মত ধকল সইতে পারি না।
মোহর বললো, যান দাদুভাই। আমরাও বিশ্রাম নিচ্ছি।

www.pathagar.com

দাদুভাই চলে গেলে মেহরাজ বললো, দাদুভায়ের বিশ্রামটা কেমন, জানিস?

- না তো!

উনার বিশ্রাম হল, এখন শুয়ে বই পড়বেন। একটুও কিন্তু দিনে ঘুমান না। তা সে গরমকাল হোক কিংবা অন্য সময়।

- সেকি! বই পড়বেন? এটা কি তাহলে বিশ্রাম হল?

- তবে আর বলছি কি! সেই আসর পর্যন্ত। আসরের আজান শুনে বই বন্ধ করে তবে শোয়া থেকে উঠবেন।

- এত কি বই পড়েন?

- বই-এর কি আর শেষ আছে? এই যেমন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ইতিহাস, এমনকি ছোটদের বাংলা ব্যাকরণ, এমনকি ধারাপাতও।

- তাই! অবাক হল মোহর।

- তাই মানে? দাদুর পড়াশুনা দেখলে আমিও শিউরে উঠি। বাব্বা! মানুষ এত পড়তে পারে? দাদুকে বলতেই তিনি বলেন, শোনো দাদুভাই! বই-ই হল একমাত্র শর্তহীন, শত্রুহীন বন্ধু। বই-এর সাথে সারাক্ষণ কথা বল- সে বিরক্ত হবে না, রাগ করবে না, তোমার কাছে কিছুই চাইবে না, তোমার সাথে আড়ি দেবে না। তার হিংসা নেই, ঈর্ষা নেই, ক্ষোভ নেই, ক্লান্তিও নেই। সে কেবল তোমাকে দেবে। দিয়েই তার যত আনন্দ। বলো, বই-এর মত এমন বন্ধু তুমি আর কোথায় পাবে?

মোহর বললো, সত্যি দাদুভায়ের মত এমন একজন পণ্ডিত মানুষকে পেয়ে আমরা ধন্য।

মেহরাজ বললো, তা ঠিক বটে। তবে তাঁর কাছ থেকে তো তেমন কিছুই নিতে পারলাম না। এখানেই আমার যত আফসোস!

- পারলি না মানে? তুই তারই মত হয়ে উঠছিস। কত সৌভাগ্যবান তুই। আর আমি!...

- নারে মোহর। দাদুভায়ের কাছ থেকে তেমন কিছুই নিতে পারিনি। পারলে আমার জীবনটা আরও অন্যরকম হতে পারতো। এ আমার ব্যর্থতা।...

- ব্যর্থতা বলছিস কেন? এখনো তো সময় ফুরিয়ে যায়নি। আরও সঞ্চয় করতে পারবি।

মেহরাজের গলাটা সামান্য ধরে এল। বললো, দোয়া করিস যেন তাই পারি। জানিস মনটা আজকাল প্রায়ই ভারী হয়ে ওঠে।

- কেনরে?

www.pathagar.com

- আজকাল দাদুভাই প্রায়ই মৃত্যুর কথা বলেন। যখন তখন বলেন। রাতেও তেমন ঘুমান না। সারাক্ষণ কী সব চিন্তা করেন। মাঝে মাঝে খুব গম্ভীর হয়ে যান। আমার খুব ভয় লাগেরে!

- কীসের ভয়?

- দাদুকেও যদি হঠাৎ হারিয়ে ফেলি!...

- বাদ দে তো ওসব চিন্তা! খামোখা মন খারাপ করতে নেই।

- আমিও তাই মনে করি। কিন্তু পারি না যে। ভাবনাটি ঘুরে ফিরে এসেই যায়। জানিস তো, আমার আব্বা নেই। ঐ দাদুভাই আর আম্মা বহু কষ্ট করে আমাকে ছায়ার মত আগলে রেখেছেন। ভয় হয় যদি সেই ছায়াটুকুও হারিয়ে ফেলি!

- অতদূর ভাবতে নেই মেহরাজ। বরং আল-াহর কাছে সবকিছু সমর্পণ করে বল, হে আল-াহ! সকল অবস্থায় আমি তোমার রহমত চাই। তুমিই আমাদের একমাত্র জামিনদার। যাতে কল্যাণ আছে, তুমি আমার জন্য সেটাই কর।

একটা দম ছেড়ে মেহরাজ বললো, ঠিকই বলেছিস। মানুষ ভেবে আর কীই বা করতে পারে? বরং আল-াহর ওপর আস্থা আর ভরসা রাখাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। আর তাতে সান্ত্বনা এবং সুখও আছে।

তবে আর চিন্তা কি!

এবার একটু হাস।

- বলে দু'জনেই হেসে উঠলো।

www.pathagar.com

সাত.

অনেকদিন পর আজ বিকালে হাডুডু খেলতে গিয়েছিল মেহরাজ। তার খেলার সাথী বলতে পাড়ার হাসান, আদনান, হাশিম আর জিয়াদ।

আসরের পর তারা এমনভাবে ধরলো যে, সে আর না করতে পারলো না। আম্মার কাছে অনুমতি নিতে গেলে তিনি বললেন, যাই কর না কেন, মাগরিবের আগেই ফিরে আসতে হবে।

মেহরাজ তাতেই রাজি এবং খুশি।

সত্যিই সে ফিরে এল সন্ধ্যার আগেই।

মাগরিবের নামাজ আদায় করে উঠোনে পা রাখতেই রুকাইয়া ডাকলেন, মেহরাজ! এদিকে এস।

- জ্বি আম্মা।

মেহরাজ রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

রুকাইয়া বললেন, আকরাম এসেছিল।

- কখন?

- বিকালে। তুমি খেলতে যাবার পর।

- আমাকে একটু খবর দিলে হতো।

- ব্যস্তভাবে চলে গেল। বললো ওর আরও কোথায় কোথায় যেতে হবে।

- কিছু বলে গেছে?

- না, তেমন কিছু না। একটি চিঠি রেখে গেছে।

- কই, দেখিতো?

- তোমার ব্যাগের ওপর আছে।

- মেহরাজ আর দেরি করলো না। এক দৌড়ে বারান্দায় উঠলো। ব্যাগের ওপর থেকে চিঠিখানা নিয়ে দ্রুত হারিকেনের আলোর সামনে মেলে ধরলো। আকরাম মাত্র দুই লাইন লিখেছে, 'আগামীকাল বিকালে চারটায় বাজারে আসিস। জরুরি কথা আছে।'

জরুরি কথা? কী কথা? মেহরাজ একটু ভাবলো।

বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে মেহরাজ।

জাফরী সাহেব মসজিদ থেকে একটু দেরিতে বের হয়েছেন। মসজিদ কমিটির মিটিং ছিল। মিটিং শেষ করে বাড়িতে ফিরেই ডাকলেন, দাদুভাই!...

www.pathagar.com

- জ্বি, বারান্দায় বসে মেহরাজ জবাব দিল।

- একা বসে কী করছো?

- কী আর করবো! এই বসে আছি। বারান্দায় উঠবেন?

উঠোনের চেয়ারে বসতে বসতে দাদুভাই বললেন, উঠবো। আগে একটু বসে নিই। কোমরটা ব্যথা করছে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রুকাইয়া। একটা বাটিতে কিছু খাবার আর গ-াসে পানি। বললেন, এটুকু খেয়ে নিন। পান আনছি।

- এটা কি বউমা।

- সামান্য পায়েস।

হাসলেন জাফরী সাহেব।

কখন কীসের প্রয়োজন তা কখনই বলে দিতে হয় না রুকাইয়াকে।

এমন সেবা ক'জনের ভাগ্যে জোটে? ভাবতে ভাবতে তিনি খুবই কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলেন রুকাইয়ার প্রতি। বললেন, দাদুভাইকে দিয়েছ?

- এই তো দিচ্ছি।

বলতে বলতে তিনি আর একটি বাটি নিয়ে মেহরাজকে দিলেন। হারিকেনের সামনে ছেলেকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কীরে! কি হয়েছে?

- কই, কিছু না তো?

- তাহলে ওভাবে বসে আছিস কেন?

- কী করবো?

- না হয় উঠোনে গিয়ে দাদুভায়ের পাশে বসে কথা বল। উনি খুশি হবেন।

রুকাইয়া পিতৃতুল্য এই অসাধারণ মানুষটিকে সব সময় খুশি রাখতে চান। তিনি যেন কোনো সময় কষ্ট না পান, দুঃখ না পান- সেদিকে তীক্ষ্ম নজর রাখেন। ভাবেন, আমার প্রতি, মেরহাজের প্রতি তাঁর দান যে সীমাহীন। সেবা দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে যতটুকু সম্ভব সেই ঋণের কিছুটা হলেও শোধ করা জরুরী।

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে রুকাইয়া আবার নিজেকেই প্রশ্ন করেন, আসলেই ভালবাসার ঋণ কি কখনো শোধ করা যায়? এই যে তিনি সারাটি জীবন কেবল আমাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গেলেন, তার প্রতিদান আমি কী দিয়ে দেব? কৃতজ্ঞতায় তার দুটো চোখ ভিজে গেল।

জাফরী সাহেব ডাকলেন, বউমা!...

- জ্বি আব্বাজান! আসি...

www.pathagar.com

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রুকাইয়া এগিয়ে এলেন।

জাফরী সাহেব বললেন, কী ব্যাপার, দাদুভাই আজ মন খারাপ করে বসে আছে কেন? কিছু বলেছ নাকি?

- কই নাতো?

- ঠিক আছে, যাও।

জাফরী সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বারান্দায় উঠে হাতের ছড়িটা চালের বাতায় ঝুলিয়ে রাখলেন। মেহরাজের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, একটু বসতে পারি?

তিনি এমনভাবে বললেন যে, মেহরাজও হেসে ফেললো। বললো, বসবার জন্য আবার অনুমতি চাইতে হয় নাকি? তাও আবার নিজের বাড়িতে?

বসতে বসতে দাদুভাই বললেন, চাইতে হয় না মানে? একশোবার অনুমতি চাইতে হয়। বিশেষ করে আমার মত বৃদ্ধ মানুষদের।

- কেন?

- কেন আবার! বোঝ না, বয়স হয়ে গেলে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পায়। তখন সব কিছু হিসাব কষে করা যায় না। অনাহুতভাবে কোথাও প্রবেশ করলে অনেকেই বিরক্ত হয়। এটা অন্যায় কিছু নয়। স্বাভাবিক।

জাফরী সাহেবের বয়স হলেও তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা এখনও যে অটুট তা বোঝা যায়।

মেহরাজ দাদুভায়ের দিকে ঝুঁকে প্রতিবাদ করে বললো, কিন্তু দাদুভাই! আপনার তো সেরকম বয়সই হয়নি। আপনার অনুমতি নেবার দরকার কি?

বয়স হয়নি ওগো! বউমা, শোনো তোমার ছেলে বলে কি!

জাফরী সাহেব মেহরাজের মাথায় হাত রেখে চুলে বিলি কাটতে কাটতে আবার বললেন, এক অর্থে তোমার কথাই ঠিক।

- যেমন?

- যেমন আমার সামনে বয়স কম, আর তোমার সামনে বয়স বেশি।

- দাদুভাই, আবার?

জাফরী সাহেব সতর্ক হলেন, হ্যা, তাইতো! ভাবলেন, মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ের দিকে এই মুহূর্তে এগুনো ঠিক নয়। এতে করে কচিমনে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে তিনি বললেন, কিন্তু দাদুভাই তোমার মনটা খারাপ কেন, তা তো বললে না?

মেহরাজ একটু ভেবে নিল। দাদুভাইকে কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা।

www.pathagar.com

জাফরী সাহেবও মেহরাজের চোখে মুখে দ্বিধার কুয়াশা দেখে বললেন, বলতে না চাইলে থাক।

- তা হবে কেন? এমন কোনো গোপনীয় বিষয় নয়।

- তবে বলছো না কেন?

- বলবো তো, আপনাকে না বলে কি আমি পারি?

- তাহলে বলে ফেল না! আমিও যে টেনশনে আছি।

- টেনশনের কিছু না। খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।

- সেটা কি হে!

- আকরাম এসেছিল বিকালে।

- তা তো হলো, কিন্তু কথাটি কি?

- আমাকে ঢাকায় যাবার জন্য বলেছে।

জাফরী সাহেব আঁতকে উঠলেন। কেন, সে কী! ঢাকায় কেন?

- একটা সম্মেলন হবে। সেখানে সারা দেশ থেকে আমার মত ছেলেরা আসবে। বাছাই করা ছেলেরা। যারা সবদিক থেকেই ভাল। যারা জীবনটাকে আলোকিত করতে চায়, গড়তে চায়- এমনি ছাত্রদের একটি সম্মেলন। যেতে পারলে খুব উপকৃত হতাম। আকরাম, মোহর ওরা সবাই যাবে।

অনুমতি চাইবার ভঙ্গিতে মেহরাজ তাকালো দাদুভায়ের দিকে।

কিন্তু ঢাকার কথা শুনেই তার মুখের চেহারাটা এমন বিবর্ণ এবং ফ্যাকাশে হয়ে গেল যে, মেহরাজ সাহস করে আর এগুতে পারছে না। সে মাথা নিচু করে আড়চোখে তাকিয়ে আছে দাদুভায়ের দিকে।

দাদুভাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

মেহরাজ জানে না, ঐ দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কী লুকিয়ে আছে। আস্তে করে সে ডাকলো, দাদুভাই!

- বলো।

- এত চুপ হয়ে গেলেন যে!

জাফরী সাহেব কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বললেন, কই!

- কই মানে? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি শ্রাবণের মেঘ আপনার মুখের ওপর ভর করেছে।

এবার হেসে উঠলেন দাদুভাই। বললেন, পাগল! তোমার আব্বাও এমন সুন্দর করে, উপমা দিয়ে কথা বলতো।

www.pathagar.com

- তাই বুঝি?

- তবে আর বলছি কি। সে ছিল আস্ত এক কবি। সেই সাথে দার্শনিকও।

- সত্যিই?

আমার তো তাই মনে হয়। কিছু মানুষের মধ্যে বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা ও প্রবণতা আল-াহপাক দিয়ে দেন। কিন্তু পরিচর্যা আর অনুশীলনের অভাবে অনেকেই সেগুলোর বাস্তব পরিস্ফুটন ঘটাতে পারে না। তোমার আব্বার মধ্যে এসব যোগ্যতা ছিল, কিন্তু সুযোগের অভাবে তার অনুশীলন সে করতে পারেনি। ফলে যা হতে পারতো তা আর হতে পারেনি। এটা অবশ্য আমারই ব্যর্থতা।

- আপনার ব্যর্থতা? কথাটায় আমার জোর আপত্তি আছে।

- আপত্তি কেন দাদুভাই! যা সত্য, তাই বললাম। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যখন, তখন দেশে চলছে চরম সংকট, অভাব আর অভাব। দুর্ভিক্ষের কবলে মানুষ জীবন-মরণ লড়াই করছে। আমারও তেমন সঙ্গতি ছিল না, ফলে সংসারের হাল ধরতে এগিয়ে এল তোমার আব্বা। আহ্ এমনটি যদি না হতো তাহলে হয়তো তার জীবনটাই হতে পারতো অন্যরকম।

বলতে বলতে দাদুভায়ের চোখ দু'টো ভিজে উঠলো।

মেহরাজ বললো, দাদুভাই। আবারও কিন্তু আপনি মন খারাপ করছেন!

জাফরী সাহেব আর একটা দম ছাড়লেন। বললেন, তা ঠিক। আজকাল বেদনাগুলো বড় বেশি উথলে ওঠে। যখন তখন। ঘুমুতেও দেয় না।

বালিশে হেলান দিয়ে দাদুভাই বললেন, বুঝেছ স্মৃতির ভার বড় ভার। এ বড় শক্ত এবং কঠিন এক বোঝা।

থামিয়ে দিল মেহরাজ, থাক। আর বলতে হবে না দাদুভাই। এখন বলুন, আমি ঢাকায় যেতে পারি কিনা।

দাদুভাই বললেন এটা তোমার আম্মাকে বলো। তিনি যদি রাজি হন, তাহলে যাও।

- আহা, আম্মাকে তো বলবই। তার অনুমতি ছাড়া কি আমি কিছু করবো?

- না, কক্ষনো করবে না। তোমার আম্মার অবাধ্য হওয়া তো দূরের কথা, তার মনে কখনো এতটুকু কষ্টও দেবে না। তোমার জন্যে তার অবদানের কোনো শেষ নেই।

- সে তো বটেই। মায়ের তুলনা আর আছে নাকি?

- না, কথাটা হল না। তোমার মন্তব্যটি সামগ্রিক অর্থে, কিন্তু আমি যেটা বুঝাতে চাইছি, সে কেবল তোমার মায়ের কথা। তুমি জান না, তার শ্রম, সাধনা চেষ্টা,

www.pathagar.com

আর ধৈর্য- সে কেবল তোমার জন্যই। তোমাকে বড় করার স্বপ্নে সে বিভোর। এই স্বপ্নের জন্যই সে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। আমার এই কথার অর্থ ব্যাপক, তুমি হয়তো এখন বুঝতে পারছো না, কিন্তু আরও বড় হলে নিশ্চয়ই সেটা বুঝবে।

মেহরাজ একেবারে ছোট নয়।

অন্য আর দশটা ছেলেদের মতও না।

তাদের চেয়ে বুদ্ধি-বিবেক সামান্য হলেও তার একটু বেশি।

দাদুভায়ের এসব কঠিন কথার মর্ম যে আদৌ সে বুঝতে পারেনি তা নয়। বললো, দাদুভাই!

- বলো।

- আমি তো সার্বিক অর্থে মানুষ হবার জন্যই চেষ্টা করছি। আমার জন্য দোয়া দেবেন। দোয়া চাই, যেন অকৃতজ্ঞ না হই।

- অবশ্যই দোয়া করছি। শিক্ষিত হলেই কেবল মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ একটি বিশেষ গুণাবলীর সমষ্টি। সেই বিশেষ গুণগুলো তোমাকে অর্জন করতে হবে এবং আমি যা পারিনি, তোমার আব্বা যা পারেনি- আমাদের সেইসব অপূর্ণতাগুলো তোমাকে, হ্যা তোমাকেই পূর্ণ করে তুলতে হবে। তার জন্যে যে ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন, সেই বিশেষ যোগ্যতাও তোমাকে অর্জন করতে হবে।

আমি তো সেই চেষ্টাই করছি দাদুভাই। আর এজন্যেই.....

- সেটা বুঝেছি।

- তাহলে এবার বলুন, আমি ঢাকায় যেতে পারি কিনা?

দাদুভায়ের সাফ জবাব, তোমার মায়ের সাথে কথা বল।

কথা বলতে বলতে কখন যে রাত বেড়েছে তা কেউ খেয়াল করেনি।

রুকাইয়া রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, আব্বাজান রাত হয়েছে। খেয়ে নিলে ভাল হতো। আপনার আবার ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেল।

- ওহ! তা ঠিক। আমরা এবার নামাজটা আদায় করে নিই। তুমি খাবার রেডি করতে থাক।

- দাদুভাই!

মেহরাজের ডাকের অর্থ দাদুভাই বুঝে গেলেন। বললেন, খাবার পর তোমার আম্মাকে নিয়ে বসো। তখন কথা হবে।

www.pathagar.com

আট.

রাত অনেক গভীর।

মেহরাজের চোখে ঘুম নেই।

চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারছে না। তার চোখের সামনে কেবলই ভেসে উঠছে আকরামের চিরকুট।

তারপর ঢাকা বিশাল ছাত্রসমাবেশ।

হাজার হাজার ছাত্র।

সবার চোখেমুখে একই প্রত্যয়, একই স্বপ্ন, একই বেড়ে ওঠার, আলোকিত হবার অঙ্গীকার।

বালিশে মাথা রেখে এপাশ ওপাশ করছে মেহরাজ।

বালিশও যেন গমম হয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে বালিশ উল্টে নিচ্ছে।

নাহ!...

বিছানা থেকে উঠে বসলো মেহরাজ।

মাথার কাছে রাখা জগ থেকে পানি ঢেলে খেয়ে নিল। তারপর নেমে এল উঠোনে।

পরিষ্কার আকাশ।

আকাশ ভরা সোনালি তারার মেলা।

হালকা বাতাস।

পুবের মাঠের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আবছা দেখা যাচ্ছে। বাবলা এবং খেজুর বাগানগুলোকে মনে হচ্ছে এক একটি বালির টিলা।

এক দৃষ্টিতে মেহরাজ চেয়ে আছে মাঠের দিকে।

নারকেল গাছ থেকে একটি পাখি ডানা ঝাঁপটিয়ে উড়ে গেল তার মাথার ওপর দিয়ে। উত্তরে বাঁশবাগান ঘেঁষে ইটের পাঁজার কাছ থেকে শিয়াল ডাকছে হুঁককা হুয়া।

গা ছমছম করা অবস্থা। তবুও ভয় করছে না মেহরাজের বরং তার মধ্যে এক ধরনের ভাল লাগা, এক ধরনের স্বপ্ন পিল পিল করে হেঁটে যাচ্ছে।

পেছন থেকে কার যেন পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। ফিরে তাকালো মেহরাজ। বললো, ও আম্মা।

www.pathagar.com

- হ্যা। তুই এত রাতে উঠোনে কি করছিস?

- ঘুম আসছে না, কী করবো?

- তাই বলে এত রাতে একা উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকবি?

হাসলো মেহরাজ। একা কোথায় আম্মা! দেখুন না আকাশে কতশত তারা, ঐ চাঁদ, জোছনা, ঐ সব গাছগাছালি।...

আম্মার কণ্ঠে কৃত্রিম ধমক, নে থাক হয়েছে। এখন শুতে যা।

- আম্মা! মেরহাজের গলায় আদর ঝরে পড়ছে।

- বল।

- আমার পাশে একটু দাঁড়াবেন?

- পাগল ছেলের কথা শোনো। এত রাতে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকবো?

- তাহলে চলুন বারান্দায়। আপনার পাশে বসতে খুব ইচ্ছে করছে।

মায়ের মন!

কেমন যেন হু হু করে কেঁদে উঠলো রুকাইয়ার ভেতরটা। হৃদয় জুড়ে কেবল কান্নার রোল। আস্তে করে বললো, বারান্দায় যা। আমি আসছি।

বারান্দায় উঠে মেহরাজ তার বিছানায় আধশোয়া হয়ে আম্মার জন্যে অপেক্ষা করছে। রুকাইয়া তার পাশে বসে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, এখন ঘুমাও। রাত জাগলে যে অসুখ করবে।

- আপনি পাশে থাকলে একরাত কেন, শত রাত জাগলেও আমার কিচ্ছু হবে না।

- পাগল!

- কিছু বলবে ?

- জ্বি।

- বলো।

- বলছিলাম আকরামের কথা।

- কী?

- ও কিছু বলেনি?

- নাতো! শুধু চিঠিটাই দিয়ে দ্রুত চলে গেল। কেন, কী হয়েছে?

- না, তেমন কিছু না।

- চিঠিতে কি লেখা ছিল? কে দিয়েছে?

- ওই লিখেছে।

www.pathagar.com

- কি লিখেছে, বলা যায়?

- যায়। আপনাকে না বললে সমাধান হবে কীভাবে?

- তার মানে? কোনো সমস্যার ব্যাপার নাকি?

- না, তেমন কিছু না।

- তবে? বলার মত হলে বলে ফেল।

- এখন বলবো নাকি কাল দাদুর সামনে?

এ ধরনের কথায় আবেগ এবং কৌতূহল স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। তিনি বললেন, এখন বল।

মেহরাজ মাথা চুলকিয়ে বললো, আকরাম জানিয়েছে, ঢাকায় আমাদের মত ছেলেদের নিয়ে একটি সম্মেলন হবে। আমার তো পরীক্ষা শেষ। যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমিও যেতে পারি। মোহর, হাসিব, রমিজ ওরা সবাই যাবে।

ঢাকায় যাবার কথা শুনে আম্মা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ নীরব।

মেহরাজ বললো, অবশ্য আপনি যদি না চান তাহলে যাবো না। আপনাকে আমি কষ্ট দিতে পারবো না।

রুকাইয়া তখনও নীরব।

তিনি কি কিছু ভাবছেন?

কী ভাবছেন?

সে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

- মেহরাজ দরদভরা কণ্ঠে ডাক দিল, আম্মা!

- বলো।

- কথা বলছেন না যে! আমার ওপর কি রাগ করেছেন?

- কেন?

- কথাটি বললাম বলে?

- এতে তোমার অপরাধ কোথায়?

- তবে কিছু বলছেন না যে!

- কী বলবো! আম্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

- হ্যা, না কিছু একটা তো বলতে হবে। আকরাম আবার আসবে। তাকে কী বলবো?

রুকাইয়া একটু ভাবলেন। তারপর নিচুস্বরে বললেন, তোমার কথাটি খুব সাধারণ। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে জবাব দেয়াটা একটু কঠিন। ভাববার জন্য

www.pathagar.com

আমাকে কিছুটা সময় দাও।

ওপরের দিকে দেখলে রুকাইয়া খুব সহজ সরল এবং নরম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি অসম্ভব জেদী, সাহসী এবং কঠিন।

মেহরাজ আম্মার কণ্ঠস্বর বুঝতে পারলো। বললো থাক এখন, কাল জানালেও হবে।

- তোমার দাদুকে বলেছো?

- হ্যা।

- তিনি কি বলছেন?

- দাদুভাই আপনাকে বলতে বলেছেন।

- তার কি সম্মতি আছে?

- তা কিছু জানাননি।

- ও আচ্ছা।

আম্মা আবার থামলেন।

পরিস্থিতিটা মেহরাজের ভাল লাগছিল না। নিজের ঘুম না হোক, আম্মাকেও না ঘুমানোর কষ্ট দিতে তার খারাপ লাগছিল। পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য সে বললো, আম্মা!

- বলো।

- আমার খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে।

- কী খাবে?

- যা দেবেন, তাই। তবে তার আগে একটি শর্ত।

- সেটা আবার কী?

- আপনাকে একটু হাসতে হবে। আপনার মুখ গোমড়া দেখলে আমার শুধু কান্না পায়।

- দুষ্টু ছেলে, মায়ের জন্যে খুব দরদ, তাই না!

আম্মা হেসে উঠলেন। তারপর হারিকেন হাতে নিয়ে রান্না ঘরে প্রবেশ করলেন। একটু পরে তিনি একটি বাটিতে কয়েকটি কুলি পিঠা নিয়ে হাজির। বললেন, এগুলো খেয়ে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়। ভোর হতে বোধ হয় আর বেশি বাকি নেই।

- আম্মা, কুলি পিঠা? উহ! কীযে মজা! কখন বানালেন? মেহরাজের চোখেমুখে বিস্ময়।

- এইতো রাতেই বানিয়েছি। তোমার তো আবার যখন তখন খাবার দরকার হয়।

www.pathagar.com

ঘরে সব সময় কিছু না কিছু না রাখলে আমার কি চলে?

আম্মা বলে কথা!

ছেলের জন্য সন্তানের জন্য আম্মা ছাড়া এত গভীরভাবে, এমন দরদ দিয়ে, এমন প্রাণ দিয়ে পৃথিবীর আর কেইবা ভাবে?

পিঠার একটি অংশ মুখে দিতে দিতে কৃতজ্ঞতায় মেহরাজের চোখ দু'টো ছলছল করে উঠলো। রুকাইয়ার মুখের কাছে একটি পিঠা তুলে ধরে বললো, আম্মা আপনিও আমার সাথে একটু খান।

- দেখোতো পাগলের কাণ্ড!

- না, আম্মা, আপনাকে খেতেই হবে। মেহরাজ আম্মার মুখের ভেতর গুঁজে দিল একটা কুলি পিঠার অর্ধেকটা অংশ।

আম্মা পিঠা খেতে খেতে বললেন, তোমার আব্বাজানও কুলিপিঠা খুব পছন্দ করতেন। তোমার দাদুভাইও। তাকেও ডাকবে নাকি? বেশ মজা হতো।

মা-ছেলের কথার আওয়াজ জাফরী সাহেব শুনতে পেয়েছেন বেশ আগেই।

কিন্তু ওঠেননি ইচ্ছে করেই।

ভেবেছেন, তাদেরকেও কিছুটা সময় দেয়া দরকার।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, বউমা দাদুভাইকে কম করে দাও। আমার জন্যে বেশিটুকু যেন থাকে। আমি কিন্তু তোমার বড় ছেলে।...

দাদুর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো।

বাড়িতে এখন এই মুহূর্তে যেন একটি বেহেশতি হাওয়া ফুরফুর করে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

আহ! কী সুবাসিত, কী স্নিগ্ধ, কী শীতল সেই হাওয়ার স্পর্শ!

www.pathagar.com

নয়.

জাফরী সাহেব মসজিদ থেকে আজ আসরের নামাজ শেষে বাড়িতে চলে এলেন। রুকাইয়া উঠোনে কাজ করছেন।

বিকালে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে চলে পয়-পরিষ্কারের ধুম। উঠোন, বারান্দা, ঘর ঝাড়ু দেয়া, কাপড়-চোপড় গুছানো। ছাগল, গরু, হাঁস-মুরগী কোঠায় তোলা, রান্নাঘরে কাঠ নেয়া, চাল বাছা, তরকারি কুটা, কলসে পানি ভরা- কতশত কাজ! দশহাতে কাজ করেও পেরে ওঠা দায়।

সেখানে এই বাড়িতে মাত্র একজন রুকাইয়া। তার কোনো বিশ্রাম নেই। ক্লান্তি নেই। একটানা কাজ করেই চলেছেন।

জাফরী সাহেবকে বিকালে উঠোনে দেখে কিছুটা অবাক হলেন রুকাইয়া। সাধারণত এ সময়ে তিনি মসজিদেই থাকেন। আজ হঠাৎ...

চিন্তায় ছেদ পড়লো জাফরী সাহেবের আন্তরিক ডাকে, বউমা!...

- জ্বি আব্বাজান... হাতের কাজ ফেলে রেখে দ্রুত চেয়ারটি উঠোনের নির্দিষ্ট স্থানে এনে দিলেন। বললেন, বসুন। একটু চা করে দেব?

- দাও।

রুকাইয়া চায়ের জন্য রান্না ঘরে গেলেন। চুলা জ্বালিয়ে ছোট পাতিলে পানি বসিয়ে আবার ফিরে এলেন, কী যেন বলতে চাইছিলেন আব্বাজান?

- ও হ্যা। দাদুভাই কই?

- সম্ভবত পাড়ার দিকে গেছে।

- পাড়ায় কেন?

- ওতো তেমন যায়ও না। আজ কি জন্যে যে গেল, বুঝতে পারলাম না।

কথা শেষ না হতেই মেহরাজ এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার দাদুভাই, আজ যে বিকালে উঠোনে? সূর্য কোন্ দিকে উঠলো!

হাসলেন জাফরী সাহেব, সূর্য এখন পশ্চিমে। ডুবুডুবু অবস্থা।

- ও তাই বুঝি!

রুকাইয়ার দিকে তাকিয়ে মেহরাজ আবার বললো, আম্মা খিদে লেগেছে। কিছু খেতে পারলে ভাল হত।

রুকাইয়া রান্না ঘরে যেতে যেতে বললেন, তোর দাদুভায়ের কাছে বস। চা-নাস্তা আনছি।

www.pathagar.com

চা-নাস্তায় জমে উঠেছে পরিবেশটা।

তাদের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তিতে রুকাইয়ার হৃদয়টা ভরে উঠলো। খেতে খেতে মেহরাজ বললো, আম্মা!

- বলো।

-আমার প্রস্তাবটা কী হলো? আকরাম আর মোহর এসেছিল। ওদেরকে কাল আসতে বলেছি।

রুকাইয়া পানির জগ-গ-াস গুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, এ ব্যাপারে রাতে কথা হবে। তোমার দাদুভায়ের সামনে।

- ঠিক আছে, বলে মেহরাজ উঠে দাঁড়ালো।

- কীরে আবার কোথায় যাবি? রুকাইয়ার চোখেমুখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

- বারে, মাগরিব হয়ে এল না! অযু করতে হবে।

মেহরাজ চলে গেল কলপাড়ের দিকে।

জাফরী সাহেব চেয়ারে বসে আছেন। রুকাইয়াকে ডাকলেন, বউমা!

- জ্বি আব্বাজান।

- কাছে এস।

- জ্বি, বলুন।

- মেহরাজ কি কিছু বলেছে?

- জ্বি। ঢাকায় যাবার কথা বলছিল।

- কি বললে?

- কিছু বলিনি। বলেছি রাতে আপনি সহ তার সাথে কথা বলবো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন জাফরী সাহেব। বললেন, এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছ কি?

- না, এখনো কিছু ভাবিনি। আর আপনি যেখানে আছেন, সেখানে আমি কীইবা আর ভাববো? আপনি যেটা ভাল মনে করেন, সেটাই হবে।

- এটা ঠিক নয় বউমা! তোমার ভূমিকাই মুখ্য। তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

- ওভাবে বলবেন না আব্বাজান। আপনি তো কেবল মেহরাজের অভিভাবক নন, আমারও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জাফরী সাহেব বললেন, আমারতো সময় হয়ে এসেছে। আমার ওপর আর আস্থা রাখা ঠিক নয়। নিজেই হাল ধরো।

- আব্বাজান! ওভাবে বললে আমি খুব কষ্ট পাই। আপনি ছাড়া আমার চারকুলে আর কেইবা আছে! দুনিয়ায় কার ওপর আর ভরসা রাখবো? আপন বলতে আমার

www.pathagar.com

যে আর কেউ নেই।

- মেহরাজই তোমার দুনিয়ার জন্য অবলম্বন।

- ওইটুকু ছেলে! কবে বড় হবে, কবে দায়িত্ববান হবে সে অনেক বাকি আব্বাজান। তারপরও কি কোনো ভরসা আছে?

- তবুও ওকে মানুষ করে তুলতে না পারলে কিন্তু কষ্টের কোনো সীমা থাকবে না। জানোতো, শরিফের কী ইচ্ছা ছিল! আমার শুধু ভয় হচ্ছে, আমার দায়িত্ব আমি শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করে যেতে পারবো কিনা। বলতে বলতে জাফরী সাহেবের চোখ দুটো ভিজে গেল।

তাঁর মধ্যে আজ, হঠাৎ করে কেন এত আবেগ, এত ভয়, এত শংকা জেগে উঠলো?

কেন?

এক অজানা আশংকায় রুকাইয়ার বুকটাও থরথর করে কেঁপে উঠলো। মনে হলো, তার বুক নয়, যেন পুরো উঠোনটাই চরকির মত কেবলই ঘুরছে।

তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না।

দ্রুত রান্না ঘরের দিকে চলে গেলেন।

পাতিলে ভাত ফুটছে গজগজ করে।

জ্বলন্ত চুলা।

চুলার সামনে বসে আঁচলে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলেন রুকাইয়া।

www.pathagar.com

দশ.

রাতের খাবার শেষে, সব কাজ সেরে রুকাইয়া বারান্দায় এসে বসলেন।

জাফরী সাহেব দেয়ালে বালিশ রেখে হেলান দিয়ে বসেছেন।

পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

মেহরাজ দাদুর ডান পাশে।

রুকাইয়া পান এগিয়ে দিলে বললেন, আব্বাজান!

- বলো।

- মেহরাজ বলছিল সে ঢাকায় যাবে।

- শুনেছি। তোমার অভিমতটা ওকে জানিয়ে দাও।

মেহরাজ বুঝে উঠতে পারছে না, সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আম্মা এবং দাদুভাই কেন এতটা সিরিয়াস হয়ে উঠেছেন! ঢাকা কি এমন কিছু? ইচ্ছে করলেই যখন-তখন যাওয়া-আসা করা যায়। সবাই তাই করছে। তবে এ নিয়ে তারা কেন এমন করছেন?

বিষয়টি নিয়ে মেহরাজ বেশ ভাবছে। এখন যেন তার আর ধৈর্যও থাকছে না। সে জিজ্ঞেস করলো, দাদুভাই! একটা বিষয় আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

- কী?

- এই সামান্য ঢাকায় যাবার বিষয়টি। আপনারা এমন করছেন কেন?

- কেমন?

- সেটা ঠিক বুঝাতে পারবো না। তবে মনে হচ্ছে, আমি যেন আপনাদেরকে ছেড়ে চিরতরে ইউরোপ-আমেরিকায় চলে যাচ্ছি।

দাদুভাই একটা দম ছেড়ে বললেন, বিষয়টি তোমার কাছে যতটা ছোট, আমাদের কাছে কিন্তু তা নয়।

- কেন?

- সেটা তোমার আম্মাকেও জিজ্ঞেস করতে পার।

মেহরাজ আম্মার দিকে তাকিয়ে বললো, আম্মা! আমার খুব খারাপ লাগছে। দয়া করে বিষয়টি পরিষ্কার করলে আমি হালকা হতে পারি।

রুকাইয়া গম্ভীর হলেন।

এত গম্ভীর যে তার মুখের দিকে তাকাতেও মেহরাজের কষ্ট হচ্ছে।

ভয় করছে।

রুকাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, আব্বাজান!

www.pathagar.com

- বলো।

- মেহরাজকে আমি বিষয়টি বলতে পারছিনে। আপনি বলুন।

মেহরাজ অসহায় ভঙ্গিতে একবার আম্মার দিকে একবার দাদুর দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে-মুখে কৌতূহলমিশ্রিত জিজ্ঞাসু।

দাদুভাই এবার কিছুটা শক্ত হয়ে বসলেন।

চোখ থেকে চশমটা খুলে হাতে ধরে রেখেছেন। তারপর বললেন, শোনো দাদুভাই! তোমার আব্বা লেখাপড়া করেছে ঢাকায়। চাকরি করতো ঢাকায়। তোমার আম্মাও ঢাকায় থাকতো। তোমার জন্মও ঢাকায়। তোমার বয়স যখন চার বছর তখন!...

দাদুভাই থেমে গেলেন। আম্মার অবস্থা তার চেয়েও করুণ।

এতবড় হয়েছে মেহরাজ। কিন্তু আব্বার মৃত্যুর ব্যাপারটি নিয়ে কেউ কখনো বিস্তারিত তাকে জানায়নি।

সেও অতোটা কৌতূহল ছিল না।

ভাবতো কষ্টকে বাড়িয়ে লাভ কি?

কিন্তু আজ, আজতো শুনতে না চাইলেও তাকে শুনতে হচ্ছে।

হবেও বটে।

কারণ বাস্তব যত কঠিন আর নির্মমই হোক তার মুকাবিলা তো করতেই হবে।

মেহরাজ জিজ্ঞেস করলো, তারপর?

দাদুভাই খুব করুণ স্বরে বললেন, তারপর? তারপর একদিন তোমার আম্মা ফিরে এলো তোমাকে বুকে আঁকড়ে ধরে। তুলে দিল আমার কোলে।

- কিন্তু আব্বাজানের মৃত্যু?

- সে এক করুণ অধ্যায়। সে এক বেদনাদায়ক ইতিহাস! তুমি তোমার আব্বার ইন্তেকালের খবরটাই কেবল জান, পেছনের ইতিহাস জান না। তোমার আব্বাও স্বপ্ন দেখতো তোমার মত। দেশ, সমাজ, মানুষকে আলোকিত করার জন্য জীবন বাজি রেখেছিল। কিন্তু শেষ করতে পারেনি তার কাজ।

থামলেন দাদুভাই।

মেহরাজ বললো, তারপর? বলুন দাদুভাই!

- না আজ থাক। আর একদিন হবে।

জাফরী সাহেব চোখ মুছলেন। তারপর বললেন, যে শহর তোমার আব্বার লাশটিকেও শনাক্ত করার সুযোগ রাখেনি সেই শহরে তুমি যাবে কিনা, সেটা তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মনে রেখ, তোমার আম্মার এ দুনিয়ায় তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। মেয়েটি খুব দুখিনী দাদুভাই!

www.pathagar.com

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে রুকাইয়া বললেন, আব্বাজান!

জাফরী সাহেব বললেন, বলো।

- আমি কাল রাতে খুব ভেবেছি।

- কী ভেবেছ? তোমার সিদ্ধান্তের কথাটাও জানা দরকার।

- ভেবে দেখেছি, আঁচলে মুড়িয়েও কাউকে ধরে রাখা যায় না। আল-াহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত।

- অবশ্যই। তারপর বলো।...

- তাই বলছিলাম, কী লাভ আঁচলের মধ্যে ছেলেটাকে লুকিয়ে রেখে? বরং ওকে ছেড়ে দেই। ওতো আর নষ্ট পথে যাচ্ছে না। যেতে পারবে বলেও মনে হয় না। কারণ ওর সামনে আপনি আছেন, আপনার ছেলের আদর্শ আছে। আদর্শ তো গড়ে ওঠে পরিবার থেকেই। শুধু বই পড়ে কি মানুষ হওয়া যায়? আদর্শ ঐতিহ্য এসব ভেতরগত, রক্তের ব্যাপার। যার রক্তে এসব মিশে আছে সে কখনো নষ্ট হতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

- তারপর? বলো।

- সেটাইতো বলছিলাম। মেহরাজ ঢাকায় যাক। কেবল ওদের সম্মেলনের জন্যই নয়। বরং ওখানে গিয়ে কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকুক। এস.এস.সি'র রেজাল্ট হবার পর কোনো ভাল একটি কলেজে ভর্তি হবে।

- বউমা!

- বলুন।

- কথাগুলো ভেবে-চিন্তে বলছো তো? ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানে কি সেটা জানো তো?

- জানি।

- তারপরও?

- কেন নয়? মেহরাজ তো আমাদেরই ছেলে। উদ্দেশ্য, কর্তব্য আর নিষ্ঠার ব্যাপারটি যদি ওর কাছে পরিষ্কার থাকে তাহলে ও একদিন মানুষ হবেই। ওর মানুষ হয়ে ওঠা ছাড়া আমার আর কীইবা চাইবার থাকতে পারে, বলুন!

- বউমা?

- জ্বি।

- আমি আজ সত্যিই খুব খুশি। এত খুশি যে তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। আমিও চাই দাদুভাই অবশ্যই ঢাকায় যাবে। যাবে, কেবল মানুষ হবার জন্য। ওর আব্বার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য।

তাদের কথা শুনতে শুনতে মেহরাজ চলে গেল অন্য এক স্বপ্নের ভুবনে।

www.pathagar.com

যেখানে হাজারো তারার ঝিকিমিকি চাঁদ জোছনার খেলা, সূর্য, কেবল সূর্য আর রোদের খেলা, সারা বেলা।

আবার ভাবে, পারবো তো?

নিজেই আবার জবাব দেয়, কেন নয়? আমাকে তো পারতেই হবে। আমি না পারলে আব্বা কষ্ট পাবেন। দাদুভাই কষ্ট পাবেন। আম্মা কষ্ট পাবেন। কষ্ট পাবেন তাদের মত হাজারো প্রত্যাশিত মানুষ। সুতরাং আমাকে দাঁড়াতেই হবে!

আত্মবিশ্বাসে শক্ত হয়ে উঠলো মেহরাজের হৃদয়।

রাতে খুব বৃষ্টি হলো।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মেহরাজ বৃষ্টির শব্দ শুনছে।

এক সময় ক্লান্তিতে সে উঠে বসলো।

বারান্দায় পা ঝুলিয়ে দিয়ে সে এবার বৃষ্টি দেখছে।

মুষলধারে বৃষ্টি।

গাঢ় আমানির মত বৃষ্টির রং।

বৃষ্টির সেই রং ভেদ করে উঠোনের নারকেল গাছটিও ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না।

খড়ের চালের ছাট দিয়ে হালকা স্রোতের মত পানি গড়িয়ে ছেচে পড়ছে। সেখান থেকে আরও একটু দ্রুত গতির স্রোত নেমে যাচ্ছে পুবের দিকে।

কতক্ষণ যাবৎ বসে বসে সে বৃষ্টি দেখছে, তার খেয়াল নেই। রুকাইয়ার আওয়াজে তার হুঁশ ফিরলো। ঘর থেকে কখন তিনি বারান্দায় চলে এসেছেন, মেহরাজ বুঝতে পারেনি। তিনি ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন, কিরে, ঘুম আসছে না?

- না আম্মা।

- কতক্ষণ জেগে আছিস?

- তা বলতে পারবো না। তবে অনেকক্ষণ।

- বৃষ্টি দেখতে খুব ভাল লাগছে?

- হ্যা আম্মা। খুব মজা লাগছে।

- তোর আব্বাও এভাবে রাত জেগে বৃষ্টি দেখতেন। বৃষ্টির শব্দ শুনতেন। বৃষ্টির গন্ধ উপভোগ করতেন। বৃষ্টি দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে যেতেন।

- তাই নাকি?

- তবে আর বলছি কি!

- আম্মা!

- বল।

www.pathagar.com

- আব্বাজান কীভাবে ইন্তেকাল করেছেন, তা কিন্তু আমাকে কোনোদিনই বলেননি।

- ও কথা থাক, বাপ।

- থাকবে কেন? আমাকে জানতে হবে না?

- পরে জানলেও চলবে।

- আমার কাছে লুকানোর কোনো মানে হয় না।

- এটাকে লুকানো বলে না মেহরাজ। যিনি সত্যের জন্যে জীবন দিয়েছেন তাঁর রক্তের ইতিহাসকে লুকাবে কে? এমন শক্তি আর সাহস কার আছে?

- তবে?

- তবে আর কিছুই নয়। সে কেবল সময়ের অপেক্ষা। তোমার বয়স হলে তুমি নিজেই সেটা জানতে পারবে।

আম্মা প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঢাকায় যাবার ব্যাপারে কিছু ভেবেছ কি?

- হ্যা।

- কী ভেবেছ?

- কাল মোহর আসবে। কখন রওয়ানা হব, তখনই ঠিক হবে।

- একটা কথা বলে রাখি।

- বলুন আম্মা।

- ঢাকায় যাবার পর প্রথম দু'এক মাস তোমাকে টাকা পাঠাব। তার মধ্যেই তুমি নিজের খরচ চালিয়ে নেবার মত একটা ব্যবস্থা করে নেবে।

- আম্মা!

- বলো।

- একটু নিষ্ঠুরের মত কথা হয়ে গেল না! আমি সেখানে কীভাবে উপার্জন করবো? তাছাড়া।...

- তাছাড়া কী?

- এতটুকু বয়সে–

- এতটুকু বলছো কেন? মেট্রিক দিয়েছ। আই.এ. পড়বে। তোমার মত বয়সের ছেলেরা স্বনির্ভর না হলে চলবে কেন? সংসারের অবস্থা তোমার অজানা কিছু নয়। আব্বাজানের শরীরের অবস্থাও ভাল না। যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এর মধ্যেই আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।

- সে তো ঠিক। কিন্তু!...

- কোনো কিন্তু নয় মেহরাজ! ছোটকাল থেকে কষ্ট না কললে জীবনকে বুঝতে

www.pathagar.com

পারবে না। জীবনকে বোঝার জন্য কষ্ট এবং পরিশ্রমেরও দরকার আছে। আগুনে পুড়েই না সোনা এত খাঁটি হয়। সময়কে মুকাবেলা করতে না পারলে জীবনে বড় হওয়াতো দূরে থাক, প্রকৃত মানুষও হওয়া যায় না। তোমার আব্বাও সারাজীবন এভাবেই পাথর কেটে কেটে বড় হয়েছিলেন। ঢাকায় যাচ্ছ, দেখবে অনেকেই তার কথা বলবে। তাদের মুখ থেকে সেসব শুনে তুমি জীবন সংগ্রামের অনুপ্রেরণা পাবে। সত্য-সুন্দরের দিশা পাবে।

কথা শেষ করে একটা দম ছাড়লেন রুকাইয়া।

মেহরাজ আজ যে আম্মাকে দেখছে, এত দিনের চেনা-জানা নরম সরম স্নেহ-মমতায় ভরপুর সেই আম্মা নন।

আজকের এই আম্মার কণ্ঠস্বর, মুখের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা।

কী এক কঠিন, প্রত্যয় আর সাহসের ফুলকি তার চোখে মুখে খেলে যাচ্ছে।

আম্মার মুখের দিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে গেল মেহরাজ।

ভাবছে এও কি সম্ভব? দাদুর দুঃসময়, আম্মা একা, সংসারের নড়বড়ে অবস্থা। তার মধ্যেই একমাত্র ছেলেকে তিনি বাধ্য করছেন ঘর ছাড়তে, বাধ্য করছেন শংকায় ভরা অনিশ্চিত দূর যাত্রায়। এ কোন্ মা, যিনি নিরজের কথা ভাবছেন না, ভাবছেন না কোনো পরিণতির কথা! কেবল ছেলেকে দাবড়িয়ে দিচ্ছেন এক কঠিন সংগ্রামের পথে!

মেহরাজের গলাটা ধরে এল।

মায়ের গলা জড়িয়ে কেঁদে ফেললো মেহরাজ। বললো, মাগো!...

রুকাইয়া ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, কাঁদে না বাপ। তোমাকে হতে হবে পর্বতের মত। বুকটান করে দাঁড়াতে হবে। অনেক দায়িত্ব তোমাকে পালন করতে হবে। সুতরাং নিজেকে প্রস্তুত কর। ক্রমাগত প্রস্তুত হতে থাকো।

তোমার স্বপ্ন এবং সংকল্পই হবে :

"ছিঁড়ে যাক পাল ভেঙে যাক হাল আসুক তমসা ঘোর
সপ্তসিন্ধু পাড়ি দিয়ে তবু আনতেই হবে নতুন ভোর।"

- আমাকে আজ এমনভাবে বলছেন কেন আম্মা!

- বলছি এজন্যে যে, মনে হল আজ উপযুক্ত সময়। তোমার আব্বার নির্দেশ ছিল এমনই, যখন সময় হবে তখন তোমাকে পথনির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেয়া। উপযুক্ত সময়ে আমি তাঁর সেই নির্দেশ পালন করছি।

- আমি চলে গেলে আপনাকে কে দেখাশুনা করবে?

- আমার জন্য আল-হপাকই যথেষ্ট।

- কিন্তু আমার কি কোনো কর্তব্য নেই?

www.pathagar.com

- অবশ্যই আছে এবং সেটা সুযোগ পেলে করবেও। তবে এখন কেবল তোমার সার্বিক দিক থেকে প্রস্তুত হবার সময়। মনে রেখ, সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে জীবনে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। সর্বদা ন্যায়ের পথে থাকবে। সত্যের পক্ষে থাকবে। আর বুদ্ধি বিবেচনার সাথে কাজ করবে। আল-হপাক যে তোমার সাথেই আছেন এবং তোমার সকল কিছু দেখছেন- এটা কখনো ভুলবে না। এ কথাগুলো আমার পক্ষ থেকে বলার প্রয়োজন ছিল, বললাম।

আম্মা আর একটা দম ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, রাত বোধ হয় শেষ হয়ে এল। ঘুমুবার চেষ্টা কর।

কোথায় আর ঘুম!

আম্মার এমন সব কথার পর কি আর ঘুম আসে?

এপাশ ও পাশ করে বাকি রাতটুকু পার করে দিল মেহরাজ।

ফজরের সময় বৃষ্টিটাও ধরে এল।

দাদুভাইও নামাজের জন্য উঠে পড়েছেন।

ভিজে উঠোনে, কাদার ওপরে আম্মার পায়ের ছাপগুলো স্পষ্ট হয়ে পড়ে আছে। কী তরতাজা।

বারান্দা থেকে নেমে মেহরাজ লক্ষ্য করলো, ঐ পদচিহ্নগুলো টানা টানা, অন্যরকম দৃঢ়তার সাক্ষর।

সে আম্মার পায়ের ছাপগুলো মুছতে চায় না।

থাক না যতদূর সম্ভব ঐ চিহ্নগুলো অক্ষত, অমলিন।

বিকেলে সাইকেল চেপে মোহর আর আকরাম এলো।

মেহরাজ তার সম্মতির কথা জানিয়ে দিলে তারা আর একটুও দেরি করলো না। বললো, নারে। আজ বসা যাবে না। আরও কাজ আছে। তুই রেডি থাকিস। কাল দুপুরে আমরা রওয়ানা দেব। রাতের গাড়ি। সদরে পৌঁছুতে সময় লাগবে তো।

বলেই সাইকেলে চেপে ক্রিং ক্রিং বেল বাজিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে চলে গেল ওরা।

রাতটা একরকম উত্তেজনা আর নানা ধরনের ভাবনা-দুর্ভাবনার মধ্য দিয়ে কাটলো মেহরাজের।

দাদুভাই বার বার ডাকছেন তার কাছে।

আর আম্মা!

তিনি যেন গতরাতেই ছেলেকে বিদায় দিয়েছেন, এমন ভাব করছেন।

নাকি ছেলের বিচ্ছেদ যাতনায় তাকে আর কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না! যদি তিনি

www.pathagar.com

এতটুকু দুর্বল হয়ে পড়েন! যত শংকা কি কেবল সেই খানেই?

দুপুরের আগেও বৃষ্টি হয়েছে।

সারা আকাশ মেঘে ঢেকেছিল।

কিছুটা ঝড়ো হাওয়াও ছিল।

মেহরাজ ভাবছিল এই কহর মাথায় কী করে বের হব!

কিন্তু খাওয়া শেষে ব্যাগ নিয়ে মেহরাজ যখন বেরুল, তখন দেখলো মেঘ কেটে গেছে।

বৃষ্টি ধরে এসেছে।

আম্মা আঁচলের ভেতর থেকে একটি ডায়েরি মেহরাজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা তোমার আব্বার ডায়েরি। এতে ঢাকার জীবনের তাঁর অনেক স্মৃতিই লেখা আছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানাও আছে। তাঁরা সবাই ছিলেন তোমার আব্বার বন্ধু। ডায়েরিটা তোমার কাজে আসতে পারে। ঢাকায় গিয়ে এটা দেখ।

হাত বাড়িয়ে মেহরাজ ডায়েরিটা নিল।

জাফরী সাহেব ক্লান্তস্বরে বললেন, দাদুভাই!

মেহরাজ দাদুকে জড়িয়ে ধরলো।

হু হু করে কেঁদে ফেললো।

বললো, আসি দাদুভাই!

- হ্যা, যাও। নিয়মিত চিঠি লিখ। আমার কাছে না হলেও তোমার আম্মার কাছে। তার কথা সব সময় মনে রেখ। মেয়েটি বড় দুখিনী...

বলতে বলতে দাদুভাইও জোরে কেঁদে ফেললেন।

রুকাইয়া আস্তে করে বললেন, তোমার যাবার সময় হয়ে গেল। তোমার বন্ধুরা হয়তো বাজারে অপেক্ষা করছে।

- হ্যা, আম্মা। তাহলে আসি!

মেহরাজ ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে পেছন ফিরল।

পেছন নয়, বরং সামনের দিকেই।

তার মাথার ওপর তখন জ্বলছে সোনালি সূর্য।

রোদেলা দুপুরে গ্রামের পথ একাকী হেঁটে চলেছে মেরহাজ।...

আর পেছনে হিমালয় পর্বতের মত দাঁড়িয়ে আছেন বিশাল তেঁতুল গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দরগা ডাঙার দাদুভাই!

দাদুভাই!

সেই এক অবাক পুরুষ!

www.pathagar.com

এগার.

দাদুভাই আজ আর বেঁচে নেই!

আক্ষরিক অর্থে তিনি চলে গেছেন।

কিন্তু মেহরাজের মধ্যে চির অম্-ান হয়ে আছে দাদুভাই এর স্মৃতি, শিক্ষা এবং আদর্শ।

কেন থাকবে না?

দাদুভাই-ই তো ছিলেন মেহরাজের জন্য সুনীল আকাশ, শীতল বাতাস আর আদর্শ, শিক্ষা ও ঐতিহ্যের এক ঢেউ টলোমল পদ্মপুকুর।

এমন আদর্শ দাদুভাইয়ের কথা কি ভোলা যায় কখনো?

না, যায় না।

আর।

মুহূর্তেই মনটা ছুটে যেতে চায় বাঁকড়ার কপোতাক্ষর পাড়ে।

দাদুভাই এর কথা স্মরণ হলেই মেহরাজের বুকের জমিনটা এখনো কেমন যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।

কেবলই!... ■

www.pathagar.com

WAMY Book Series : 27
World Assembly of Muslim Youth
House # 17, Road # 5, Sector # 7
Uttara Model Town, Dhaka. Tel : 8919123